বিভূতিভূষণের ছোটগল্প:
বিষয় ও শিল্পরূপ

সন্তোষ কুমার ঢালী

জুন ২০০১

RB
B M.
891.44309
DHB
1

Dhaka University Institutional Repository

বিভূতিভূষণের ছোটগল্প ঃ
বিষয় ও শিল্পরূপ

401576

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পঃ বিষয় ও শিল্পরূপ

সন্তোষ কুমার ঢালী

জুন ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পঃ বিষয় ও শিল্পরূপ

সন্তোষ কুমার ঢালী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত
অভিসন্দর্ভ

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জুন ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এম. ফিল. গবেষক সন্তোষ কুমার ঢালী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'বিভূতিভূষণের ছোটগল্পঃ বিষয় ও শিল্পরূপ' শিরোনামের অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে প্রণীত। গবেষক এ অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ অন্য প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রি লাভ বা মুদ্রণের জন্য উপস্থাপনা করে নি।

আহমদ কবির
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা - ১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ৬

২. ছোটগল্পের শিল্পরূপ ও বিষয় পরিচর্যা ৮

৩. বাংলা ছোটগল্প ও বিভূতিভূষণ ১৭

৪. বিভূতিভূষণের ছোটগল্প ২৯

ক. বিষয় ৩০

খ. শিল্পরূপ ৪৭

৫. উপসংহার ৬৬

৬. পরিশিষ্ট ৭০

ক. বিভূতিভূষণের গল্পসঙ্কলনপঞ্জি ৭০

খ. বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের প্রথম প্রকাশের তথ্য-তালিকা ৭৩

গ. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের কনিষ্ঠতম সন্তান। শ'খানেক বছরের কিছু আগে সাহিত্যের এ ধারার সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের হাতেই প্রথম সার্থক বাংলা ছোটগল্পের সৃষ্টি ও বিকাশ। রবীন্দ্রনাথের সামসময়িককালে এবং পরবর্তীকালে অনেকেই সার্থক ছোটগল্প লিখেছেন এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদের প্রত্যেকেই স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। প্রত্যেকের গল্পেই স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

বাংলা ছোটগল্প যখন খুঁজে পেয়েছে নিজস্ব ফর্ম, সেই সময় কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি গোষ্ঠী নামে একদল প্রথাবিরোধী লেখকের আবির্ভাব ঘটে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে। এঁদের লেখায় যুগের হাওয়া - ধ্বংস, হতাশা, অবিশ্বাস। এ সময়েই আবির্ভাব বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কালের এ ঘূর্ণিস্রোতে অবগাহন না করে শান্ত যোগীর মতো তিনি যেন উপনিষদের বাণী নিয়ে অবতীর্ণ হলেন সাহিত্যের আসরে। যুগের হাওয়া তাঁকে স্পর্শ করে নি। নাগরিক জীবন থেকে মুখ ফেরালেন নিভৃত পল্লীর দিকে। কালের উত্তরোলে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থেকে একেবারে ভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে ব্রতী হলেন সাহিত্য রচনায়। সাহিত্যের বিষয় আর উপকরণ হিসেবে বেছে নিলেন চারপাশে মুক্তোর দানার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মাটিঘেঁষা গ্রামীণ জীবন; আবহমান বাংলার শ্যামল প্রকৃতি। সাদামাটা, তুচ্ছ, অকিঞ্চিতকর, সাধারণ বিষয়কে বর্ণনার গুণে করে তুললেন অসাধারণ। সৃষ্টি করলেন সম্পূর্ণ নতুন ধারা। বাংলা ছোটগল্প পেলো নতুন মাত্রা। এ ধারার তিনিই প্রথম, তিনিই একমাত্র সাধক। বিভূতিভূষণ তাই অনন্য। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এ নতুন মাত্রা সংযোজন বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। অন্যান্য সার্থক ছোটগল্পকারের মতো বিভূতিভূষণের অবদানও অনস্বীকার্য।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বিভূতিভূষণকে নতুন করে জানার, নতুন করে উপলব্ধির। তাঁকে বিশ্লেষণ করে হয়তো আমরা আরও সমৃদ্ধ হবো, বাংলা ছোটগল্প আরও উৎকর্ষ লাভ করবে - এ বোধ থেকেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প নিয়ে গবেষণার আকাঙ্ক্ষা জাগে। আমার গবেষণা কর্ম - 'বিভূতিভূষণের ছোটগল্পঃ বিষয় ও শিল্পরূপ'।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক আহমদ কবির এ বিষয়ে আমাকে নানা পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে গবেষণাপত্র তৈরীতে নির্দেশনা দান করেন। তাঁর অকুণ্ঠ শ্রম ও সহানুভূতি আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

প্রতি মুহূর্তে তাগাদা দিয়েছে আমার স্ত্রী সুমনা বিশ্বাস। তাঁর সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা ছাড়া আমার পক্ষে কঠিন হতো যথাসময়ে গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা। বিভিন্ন বই সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছে ছোট ভাই উৎপলেন্দু কীর্তনীয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল গ্রন্থাগার ব্যবহারের সর্বোচ্চ সুযোগ দিয়েছে বন্ধু প্রবীর কুমার সরকার। ইংরেজি প্রবন্ধের বাংলা পাঠোদ্ধারে সহযোগিতা করেছেন আমার সহকর্মী ইংরেজির অধ্যাপক নুরজাহান বেগম ও অসিত কুমার সাহা। সারারাত জেগে অক্লান্ত পরিশ্রম করে অক্ষরবিন্যাস করেছেন জ্যোতির্ময় চন্দ। এঁদের সহযোগিতা আমাকে নানাভাবে উপকৃত করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে।

নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে দ্রুতগতিতে কাজ করার ফলে হয়তো অনেক ভুল-ত্রুটি কিংবা বক্তব্যের অপূর্ণতা থেকে গেল। পরবর্তিতে এসব সংশোধনের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করছি।

নারায়ণগঞ্জ

জুন ২০০১।

সন্তোষ কুমার ঢালী।

*****

Dhaka University Institutional Repository

ছোটগল্পের শিল্পরূপ ও বিষয় পরিচর্যা

গল্প বলা ও শোনা মানুষের আদিমতম চিত্তবিলাস। সভ্যতার উষালগ্নে, মানুষ যখন ভাষা আবিষ্কার করলো তারপর থেকেই গল্প জন্ম নিল। মানুষের ইতিহাস যেদিন থেকে আরম্ভ, গল্পের জন্ম ও সেদিন থেকেই।[১] গল্প বলার ইতিহাস মানুষের ইতিহাসের মতোই সুপ্রাচীন। যাযাবর মানুষের মনে প্রথম যেদিন কথার অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল, সেই কথাকে যেদিন তারা প্রথম রূপ দিতে পেরেছিল ভাষার মধ্যে, মানুষের গল্প বলার আকাঙ্ক্ষা সেই আদিম দিনের।[২]

বিবর্তনের অনেকগুলি পর্ব পার হয়ে প্রস্তর যুগের পাহাড়ের কালো গুহার ভিতর বড় বড় কাঠের কুঁদো জ্বালিয়ে আমাদের শিকারজীবী পিতৃপুরুষেরা গোল হয়ে বসেছে একসঙ্গে, আগুনের রক্তাভ আলোয় শৈলপ্রাকারে তাদেরই আঁকা হরিণ ও বাইসন শিকারের বিচিত্র চিত্রকলা রচনা করেছে অপরূপ পরিবেশ। বাইরে ফার্ন জাতীয় দীর্ঘ তরুণ ঘন অরণ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করছে আর বনের কলরোলকে ছাপিয়ে ভেসে আসছে ক্ষুধাতুর নরখাদক হিংস্র জন্তুর গর্জন। সেই সময় ভিতরের ঘনীভূত নিরাপত্তার মধ্যে কথাকুশল প্রাজ্ঞেরা গল্প বলে চলেছে।[৩]

গল্প কথন এবং শ্রবণের সহজাত প্রবৃত্তি উত্তরকালের মানুষের কাছে এসে পৌঁছেছে নানা পথে, নানা ভাবে, নানা আঙ্গিকে। কালান্তর, স্থানান্তর আর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গল্প গাথার সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে অখণ্ড মানব জাতির হৃদয়মূলে। অনুভবের এই যে স্রোতধারা তা জাতক, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, হিতোপদেশ, ঈশপের গল্প, হাজার আফসান, আলিফ লায়লা প্রভৃতি কাহিনীর মধ্য দিয়ে নানারূপে, বিচিত্রভাবে পথপরিক্রমায় এসে পৌঁছেছে আধুনিক ছোট গল্পের দোরগোড়ায়।

গল্প বলার প্রবণতা মানুষের আদিম বৃত্তিগুলির মধ্যে একটি, যা অনিরোধ্য শক্তিতে আজও মানব মনে সঞ্জীব হয়ে আছে। মানুষের ইতিহাসে সুন্দর সত্যের অনুগামী। সময়ের পরিচর্যায়, জীবনের নব জিজ্ঞাসার উন্মোচনে আধুনিক ছোটগল্পের সৃষ্টি - প্রেরণা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগীয় সমষ্টি-চেতনার সঙ্গে আধুনিক কালের ব্যষ্টিবোধের সংঘাত জটিলতার মধ্যে উপন্যাস-কলার জন্ম । আমাদের ধারণা সেই অভিঘাতের তীব্রতা যেদিন নতুন ভারসমতায় সুস্থির হয়েছে, তখনই ছোটগল্পের রূপের উদ্ভব। বহমান জীবনের অপার ব্যপ্তি ও জটিলতার প্রেক্ষাপটে সমুদ ব্যক্তি মানুষ যেদিন নিজের যথার্থ অবস্থান ভূমি খুঁজে পেয়েছে সয়ম্পূর্ন প্রত্যয়ের সমৃদ্ধিতে যেদিন বৃহৎ জগতের সঙ্গে একান্ত অন্বিত হয়েছে, ছোট গল্পাঙ্গিক সেই নতুন কালের নবীন সৃষ্টি। বহমান জীবন ধারার সঙ্গে সচেতন শিল্পী ব্যক্তির আত্মার সমন্বয়ে কান্তি পেয়েছে ছোটগল্পের কলারূপ। ছোটগল্পের রূপাঙ্গিক আধুনিকতম জীবন চিন্তার ফসল।[৪]

ক্ষণ জীবনের মুকুরে চিরন্তন জীবনাকাঙ্ক্ষার ব্যঞ্জনাই ছোটগল্প সৃষ্টি করে তুলেছে। সীমায়িত জীবনের ক্ষণবৃত্তে অনন্ত জীবনের ব্যঞ্জনা রচনাতেই ছোটগল্পের রূপশৈলির বিশিষ্টতা। সমকালীন বস্তুজীবনের বৃত্তে চিরন্তন জীবন-প্রত্যয়ের ব্যঞ্জনা। তাহলে ছোটগল্প মূলত কী, ছোটগল্প কাকে বলে?

Dhaka University Institutional Repository

বা কোন্ অভিধায় ছোটগল্পকে সংজ্ঞায়িত করা যায়? গল্প বলা ও শোনা মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তির হয়েও, ছোটগল্প কেন পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যেরই সর্বকনিষ্ঠ সৃষ্টি? এ প্রশ্ন সাহিত্য পিপাসুর মনে নিরন্তর জাগরূক। প্রাচীনকালের Fable (কথা), Tale (আখ্যায়িকা বা উপাখ্যান) Parable (রূপকথা বা রূপক গল্প), Story (গল্প) ক্রমশ Novelette (বড়গল্প) এর মধ্য দিয়ে কালের দাবি মেটাতে ছোটগল্পের (Short Story) আঙ্গিকে ধরা দিয়েছে।

ছোটগল্পের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ আলোচনার আগে এর শিল্পরূপ আলোচনা প্রাসঙ্গিক। Peculiar product of nineteenth centurty হলো ছোটগল্প।[৫] আধুনিক ছোটগল্প হল যন্ত্রণার ফসল। হয় সামাজিক সংকট-নয় ব্যক্তিক সংকট উনিশ শতকের ছোটগল্পে এই দ্বিবিধ যন্ত্রণা বিদ্যমান। ছোটগল্প যন্ত্রণার ফসল রূপেই এই সময় প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছে। উনিশ শতকের শেষ ভাগ- যা বিশেষ করে ছোটগল্পের কাল, তা প্রধানত রিয়্যালিজম্ এবং ন্যাচারালিজ্মের উত্তাল তরঙ্গে কলমন্দ্রিত।[৬] সুচিহ্নিত রূপাঙ্গিকযুক্ত আধুনিক ছোটগল্পের কল্পনা করা হয় ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার লেখক Washington Irving এর Sketch book ` রচনার কাল থেকে। Before 1819 there had been Short fiction, an abundance of it; the tale in prose and verse in all languages one of the most abundant varieties of literature, but Irving was the first to recognise that it could be moulded into a prose literary form that would have lows and an individuality of its own.

তাহলে ছোট গল্পের শিল্পরূপের চেতনাও আধুনিক কালের। নদী যেমন প্রবাহিত হতে হতে রূপ পাল্টায়, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিও তেমনি পাল্টায়। পাল্টায় তার আঙ্গিক, গঠন, অভিধা। কালের চাহিদানুসারে নিত্যনতুন শিল্পীর মননের ছোঁয়ায় নিত্যনতুন ছোটগল্প রচিত হতে থাকলো এবং ছোটগল্পের বিকাশের সাথে সাথে শিল্পরূপের চেতনারও বিকাশ ঘটলো। সাহিত্য কোন ঘাটে বাঁধা শৃঙ্খলিত নৌকা নয়, সে নদীর স্রোত- তাই তাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। কেবল ধারণা দেয়া যায়। তাই নানা মনীষীর নানা মতবাদ তুলে ধরে ছোটগল্পের একটা অবয়ব দাঁড় করানোর এ আমার ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

ন্যাথানিয়েল হথর্ন (Nathaniel Hawthorne) এর ' Twice Told Tales' গল্প সংকলনের মুখবন্ধরূপে এডগার অ্যালান পো (Edgar Allen poe) ই প্রথম ছোটগল্পের বিজ্ঞানসম্মত সূত্র দিতে চেয়েছেন: " A Skilful literary artist has constructed a tale. If wise, he has not fashioned his thoughts to accommodate his incidents; having conceived, with deliberate care, a certain unique or single effect to be wrought out, he then invents such incidents- he then combines such events as may best aid him in establishing this preconceived effect. " নির্ধারিত পরিসরে, একটি বিশেষ ঘটনাকে নির্বাচন করে, তার মধ্যে বাঞ্ছিত তাৎপর্য আরোপ করা ছিল পো'র লক্ষ্য। পো'র এই প্রয়োজনসঞ্জাত শিল্পরূপ তখন ছোটগল্পের সংজ্ঞায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য কিছু কিছু মহাজনবাক্য উদ্ধৃত করা যাক -

ক) গল্পসাহিত্যের প্রথম দার্শনিক ব্র্যান্ডের ম্যাথুজ (Brander Matthews) এর মতে: পরিণতির দিক থেকে ছোটগল্প হলো প্রতীতির অবশ্যম্ভাবী সমগ্রতা, যা তাকে অন্য রচনা থেকে পৃথক করে। ছোটগল্পে সাধারণত: একটি চরিত্র, একটি ঘটনা, একটি অনুভূতি অথবা একটি অবস্থা থেকে সৃষ্ট অনুভূতিমালা নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে।[৯]

(খ) হেনরি জেমস (Henry James) বলেন: চিত্তাকর্ষক মুহূর্তে একদল মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিস্ময়কর বিষয়ের বিশ্লেষণই ছোটগল্প।[১০]

(গ) এইচ. জি. ওয়েলস্ বলেন: ছোটগল্প হচ্ছে তরুণদের খেলা।[১১]

(ঘ) ওয়েবস্টার ডিক্শানারি ও এনসাইক্লোপিডিয়ায় পাই: ছোটগল্পে সাধারণত: একটি সমস্যার সঙ্কট উপস্থাপন করা হয়।[১২]

(ঙ) Oxford Advanced Learner's Dictionaryতে পাই: ছোটগল্প উপন্যাসের চেয়ে ছোট- বিশেষত: একটি ঘটনা অথবা একটি বিষয় সম্বলিত।[১৩]

(চ) আপহ্যাম (Upham) বলেন: জীবনের সমকালীন অভিজ্ঞাতা মনস্থ করে লেখকের কল্পনা নিরাবেগ এক অবস্থা আকর্ষণীয় একটি তুলনাকেই তুলে আনে, যা তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।[১৪]

(ছ) হাডসন (Hudson) ম্যাথুজের সংজ্ঞাতেই একটু বিস্তৃত করে নিয়ে বলেছেন: ছোটগল্প হচ্ছে একটিমাত্র ভাবনাকে একক প্রয়োজপকৌশলের মধ্য দিয়ে যৌক্তিক পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।[১৫]

(জ) অধ্যাপক ফ্রেড্ লিউয়িস প্যাটির বক্তব্য: ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি বাদী গদ্যকথা যা সংক্ষিপ্ত অথচ মর্মস্পর্শী- এক মুহূর্তের আবহে চকিতে ঘটে যাওয়া ঘটনার এক হল্কা।[১৬]

(ঝ) বিখ্যাত আইরিশ গল্প লেখক সিয়ান ও' ফাওলেন (Sean o'Faolain) বলেন: ছোটগল্প এক প্রগাঢ় আত্মোন্মোচন প্রয়াস। ছোটগল্পে পাঠক এমন এক কাহিনী অনুসন্ধান করে যা লেখকের অতিসংবেদনশীল মনপাতিত এবং প্রকারান্তরে তাঁরই অন্তপ্রক্ষেপণে সহায়ক।[১৭]

(ঞ) জনৈক গল্প লেখিকা জোয়ান ভ্যাট্সেক (Joan Vatsek) বলেন: ছোটগল্প তীব্র প্রতীতিজাত এক কাহিনী যা মন্থর গতিতে কল্পলোকে প্রশাখা মেলে।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত মহাজনদের মতামতের আলোকে বলা যায় ইম্প্রেশ্যন (Impression) বা প্রতীতিমূলক, গদ্যরূপী, সংক্ষিপ্ত একটি আঘাতমুখ্য, বিশেষ কোন পরিবেশাশ্রয়ী, ঐক্য সংকট নির্ভর একটি শিল্প বস্তুই হলো আধুনিক ছোটগল্প। এসবের থেকে ছোটগল্পের একটা বাংলা সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যেতে পারে। 'ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (Impression) জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য কাহিনী যা একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।'[১৯]

দু'টো বিষয়ের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে ছোটগল্প। ১)লেখকের আত্মদর্শন বা জীবন দর্শন। ২) নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী জীবন থেকে আহরিত উপকরণ। আর একটা অপরিহার্য, তাহলো রচনার ব্যঞ্জন-ধর্মিতা।

অতএব ধরে নেয়া যায় ছোটগল্পের উপাদান তিনটি ঃ-

১) লেখকের আত্মদর্শন বা জীবন দর্শনঃ নিজস্ব একটি জগৎ জীবন মানববোধ। "শিল্পি ব্যক্তির ঘন নিবিড় অনুভব তন্ময়তা, চলমান জীবন সম্বন্ধে তার ধ্যানিজনোচিত আত্মস্থতা। সেই সুস্থির চেতনার মুকুরে জীবনের যে কোন মুহূর্ত যেন পূর্ণ জীবনের ছায়া ফেলতে পারে।"[২০]

২) অপার-বিস্তৃত রহস্য-জটিল আধুনিক জীবন ভূমি: যার প্রতি মুহূর্তে, প্রতি বিন্দুতে জমে আছে অতলান্ত রহস্য গভীরতা, তার যে কোন একটি বিন্দুর গহনে তলিয়ে পূর্ণ জীবনের একটি অখণ্ড ছায়ারূপকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে।[২১]

৩) রচনার ব্যঞ্জন-ধর্মিতাঃ যেন একটি জীবনের বিশেষ মুহূর্তের অবস্থান, অভিঘাত বা আবেগ সর্বদেশ কালের জীবন ভূমিতে উৎক্রমণ করতে পারে। গল্পের জীবনভূমির সঙ্গে শিল্পীর ভাবলোকের একাত্মতা- এ দু'য়ের সর্বাঙ্গীণ সমন্বয়ের সঙ্গমমূলেই ছোটগল্পের শিল্প -ব্যঞ্জনা।[২২]

ছোটগল্পকে হতে হবে একমুখী। একটি মাত্র সামগ্রিক বক্তব্যকেই তাতে উপস্থাপন করতে হবে। ছোটগল্পের ধর্মই হলো সূচনার মহূর্ত থেকেই তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রধাবিত হওয়া। 'ছোটগল্প শুরুর সঙ্গে সঙ্গে জ্যা মুক্ত তীরের মতো তার লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলবে'।[২৩] সে একমুখী বাণ। স্থির লক্ষ্যে, বিদ্যুৎ গতিতে, একটি ভাবপরিণামকে মর্মঘাতীরূপে বিদ্ধ করতে পারলেই তার কর্তব্য শেষ।[২৪]

ঘটনাগত, মনস্তত্ত্বগত বা চরিত্রগত-একটিমাত্র সমস্যারই সঙ্কটরূপ দেখাতে হবে ছোটগল্পে। মুহূর্তের বিন্দুমূলে জীবন-সিন্ধুর পূর্ণ চেতনা ব্যঞ্জিত হতে হবে ছোটগল্পের পরিণামে। অর্থাৎ বিন্দুর মধ্যেই সিন্ধুর অনুভব। সমকালীন জীবনের সাথে একান্ত ঘন নিবদ্ধ একটি বিশেষ প্রতীতিকে আহরণ করে নিজস্ব দর্শন বা আদর্শের জারক রসে জারিত করে লেখক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবেন এবং কাঙ্ক্ষিত

Dhaka University Institutional Repository

সত্যকে আবিষ্কার করবেন বিংবা অন্তর্নিহিত মিথ্যাকে নির্দেশ করবেন। সেখানে লেখকের ব্যক্তিত্বের পরিস্রুত স্বরূপাই স্ফটিকস্বচ্ছ চেতনালোকে দেখা যাবে। তা লেখকের সত্তারই প্রতীক। ছোটগল্প লেখকের ব্যক্তিত্বেরই এক একটি অভিব্যক্তি, বিচিত্র রঞ্জিত প্রকাশ।[২৫]

রবীন্দ্রনাথ 'সোনারতরী' কাব্যের 'বর্ষা যাপন' কবিতায় এক অলস বর্ষণমুখর দিনে যে অনুভব প্রকাশ করেছেন তাতে ছোটগল্পের চমৎকার এক দ্যুতিময় বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে -

ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ,
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

ছোটগল্প সম্বন্ধে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-'ছোট গল্প একটি বিশেষ প্রকাশভঙ্গি 'কথা'র। ইহাতে একটি বিশেষ ধরনের আর্ট প্রকাশিত।.....মূল কৌশলটি ছোটগল্পের 'মুহূর্ত' বা moment। এই মুহূর্ত সৃষ্টিই ছোটগল্পের আর্টের প্রাণবস্তু। .....'মুহূর্ত' সৃষ্টির সাহায্যেই ছোটগল্প অমর হইয়া থাকে। .....বলা বাহুল্য, অনুভূতিপ্রধান বা হইয়া ঘটনা প্রধান হইয়াও ছোটগল্প সাফল্য অর্জন করিতে পারে এবং ভালো ভাবেই পারে - তাহার প্রমাণ আধুনিক যুগের অধিকাংশ লেখকের গল্প'।[২৬] ছোটগল্পে এই পরম মুহূর্ত বা মহামুহূর্ত সৃষ্টিকেই বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোটগল্প হতে পারে অনুভূতিপ্রধান বা ঘটনাপ্রধান, কিন্তু তা যদি একটা মুহূর্তের বিন্দুতে সংহত হয়ে বিম্বিত হয়, তবেই ছোটগল্প হিসেবে তার সার্থকতা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মুহূর্তের আলোয় পাঠক চিত্তকে উদ্ভাসিত করার মধ্যে ছোটগল্পের মূল সুর নিহিত।

উপর্যুক্ত আলোচনা সাপেক্ষে ছোটগল্পের কতগুলো বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায় নিম্নরূপে:-

১.বহমান বা সমকালীন বা আধুনিক রহস্যজটিল জীবনভূমি থেকে লেখকের অনুভূতি দ্বারা আহৃত 'বুলস আই' লণ্ঠনের আলোয় দেখা একটি বিশিষ্ট রহস্য গভীরতাময় 'প্রতীতি'-যা হবে ছোটগল্পের প্রাণবীজ।

Dhaka University Institutional Repository

২.প্রাণবীজটি গল্পরূপে পল্লবিত হবে শিল্পীর ঘননিবিড় অনুভূতি তন্ময় ব্যক্তিত্বের মৃত্তিকায়। লেখক তাঁর দেশ, কাল, চরিত্র ও মানসিকতা অনুযায়ী 'প্রতীতি'র উপযোগী প্রতীক এবং তাঁর রসভাষ্য রচনা করবেন, যাতে প্রতিফলিত হবে তাঁর অনুভূতি সঞ্জাত জীবনদর্শন বা ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বা অভিব্যক্তি।

৩. ছোটগল্পে এই 'প্রতীতি'র সমগ্রতা (unity of Impression)কে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

৪ একটিমাত্র ভাবের একমুখী গতি থাকবে অর্থাৎ, একাগ্রী বাণের মতো বা জ্যা মুক্ত তীরের মতো লক্ষ্যমুখী হবে ছোটগল্প । ধ্বনিত হবে একটিমাত্র সুর বা একটিমাত্র অনুভব। পার্শ্ব উপকরণ তাতে আনুকূল্য করবে, কিন্তু অন্তরায় ঘটাবে না।

৫.ছোটগল্পে একটিমাত্র 'মহা মুহূর্ত' বা পরম (চরম) ক্ষণ (Climax) থাকবে গল্পের সমগ্র উৎকণ্ঠা(Suspense) তার উপরেই নিবদ্ধ হবে।

৬.রচনার ব্যঞ্জন-ধর্মিতা (Suggestiveness) থাকতে হবে। যেন একটি জীবনের বিশেষ একটি মুহূর্তের অবস্থান, অভিঘাত বা আবেগ সর্বদেশ কালের জীবনভূমিতে উৎক্রমণ (Transcend) করতে পারে। অর্থাৎ "সীমায়িত জীবনের ক্ষণবৃন্তে অনন্ত জীবনের ব্যঞ্জনা"[২৭] থাকতে হবে। স্বল্পতম ব্যপ্তির মধ্যে বৃহত্তম সত্যকে প্রতিফলিত করবে। ছোটগল্প হবে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর দর্শন কিংবা সীমার মাঝে অসীমের উপলব্ধি।

৭. বর্ণনা হবে বিবৃতিমূলকতার পরিবর্তে ইঙ্গিতময়তা প্রধান, সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জিত। লেখককে হতে হবে সংযমী, পরিমিতি সম্পন্ন। বাক্যগঠন হবে সনেটের মত গাঢ়বন্ধ এবং গীতিকবিতার মত ভাবাত্মক।

৮. ছোটগল্পের শুরু হবে হঠাৎ , কোনরকম ভূমিকার অতিরঞ্জন ছাড়া। শেষও হবে হঠাৎ। সমাপ্তিতে পাঠকের মনে তুলবে অতৃপ্তির অনুরণন। শুরু এবং শেষ হবে নাটকীয়।

৯. ছোটগল্প আকৃতিগত নয়, প্রকৃতিগত ভাবে ছোট হবে।

১০. ছোট গল্পে সাধারণত: বিবিধ প্রবণতা থাকবেঃ ক) ঘটনামুখ্যতা, খ) চরিত্রমুখ্যতা, গ) ভাবমুখ্যতা।[২৮]

১১. ছোটগল্পে সংহতি, তীক্ষ্ণতা এবং ইঙ্গিতময়তা থাকবে।

ছোটগল্পের শ্রেণীবিন্যাস করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তা সত্ত্বেও ছোটগল্পের শ্রেণীবিন্যাস করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। নানাভাবেই ছোটগল্পের শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। সে ক্ষেত্রে প্রধানত তিনটি দিক বিবেচনায় আনতে হয়। ক) শিল্পরীতিগত দিক খ) ভাবের দিক গ) বিষয়বস্তুর দিক।[২৯] এসব দিক বিবেচনা করে মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ শ্রেণীতে ছোটগল্পকে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

১. সমাজ সম্যসামূলক।
২. রোম্যান্টিক বা প্রেম বিষয়ক।
৩. দার্শনিক।
৪. মনস্তাত্ত্বিক।
৫. ঐতিহাসিক।
৬. ডিটেকটিভ বা রহস্যমূলক।
৭. কল্পকাহিনী বা বৈজ্ঞানিক।
৮. অতিলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত।
৯. রূপক বা সাঙ্কেতিক বা প্রতীকধর্মী।
১০. রম্য বা হাস্যরসাত্মক।
১১. প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কিত।
১২. ব্যঙ্গমূলক।
১৩. কাব্যধর্মী।
১৪. আদর্শাত্মক বা রাজনৈতিক।
১৫. চরিত্রাত্মক।
১৬. পারিবারিক/ গার্হস্থ্য বা নারীপুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রশ্নাত্মক।
১৭. উদ্ভট।
১৮.মনুষ্যেতর।
১৯. বাস্তবনিষ্ঠ।
২০. বিদেশি পটভূমিযুক্ত।
২১. বিচিত্র ইত্যাদি।

ছোটগল্পের শিল্পরূপ ও বিষয় পরিচর্যা আলোচনার সাপেক্ষে বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের মূল্যায়ন করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে এ অংশে আলোচিত প্রধান প্রধান লক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করাটা সঙ্গত। বিষয়, আঙ্গিক ও প্রকরণের দিক থেকে বিভূতি-ছোটগল্প কতখানি শিল্পসফল তা আলোচিত হতে পারে। ছোটগল্পশিল্পের উপর্যুক্ত সংজ্ঞার্থ বিচার ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিভূতিভূষণ ও তাঁর ছোটগল্প বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনার অবতারণা করা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

ছোটগল্পের শিল্পরূপ ও বিষয় পরিচর্যা

তথ্য সূত্র

১. সাহিত্যে ছোটগল্প- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। প্রথম 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪০৫ ।পৃ:৩।

২. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার- শ্রীভূদেব চৌধুরী। মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৯। পৃ:১।

৩. সাহিত্যে ছোটগল্প। ঐ-পৃ:৩।

৪. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার। ঐ-পৃ: ৩১।

৫. সাহিত্যে ছোটগল্প। ঐ-পৃ:১৯৭।

৬. সাহিত্যে ছোটগল্প। ঐ-পৃ:১৯৮।

৭. Short Story - Encyclopaedia Britannica.

৮. সাহিত্যে ছোটগল্প। ঐ-পৃ:১৭৮।

৯. The short story by its effect, a certain unity of impression, which set it apart from other kinds of fiction. A short story deals with a single character, a single event, single emotions, or the series of emotions, called forth by a single situation. [Brandes Matthews- Philosophy of the short story]

১০. A short story was the analysis of a situation, the psychological phenomena of a group of men and women at interesting moment.

১১. The short story is young man's sport.

১২. A short story usually presenting the crisis of a single problem.

১৩. A piece of Fiction that is shorter than a novel, ESP one that deals with a single event or theme.

১৪. Out of rapidly moving currents of life's experiences the author's imaginations seize upon an impassive situation or a striking contrast, that effects him keenly. [The Typical forms of English literature]

১৫. S short story must contain one and only one informing idea and that his idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of method. [An introduction to the study of literature]

১৬. Impressionistic prose tale.....short, effective, a single blow, a moment of atmosphere, a glimpse of a climatic incident.

১৭. In other words the short story is an emphatically personal exposition. What one searches for and what one enjoys in a story is a special distillation, a unique sensibility which has recognised and selected at once a subject that, above all other subject, is of value to the writer's

Dhaka University Institutional Repository

temperament and to his alone his counter part his perfect opportunity to project himself. [The short story]

১৮. Stories can grow slowly in the imagination, almost by themselves, from some strong impression.

১৯. সাহিত্যে ছোটগল্প। ঐ-পৃ: ২০২।

২০. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার। ঐ-পৃ৩০।

২১. ঐ-পৃ: ৩০।

২২. ঐ-পৃ: ৩০ ও ৪০।

২৩. ছোটগল্পের সীমারেখা- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বাক্ সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড। মাঘ ১৪০৬। পৃ: ৬০।

২৪. সাহিত্যে ছোটগল্প। ঐ-পৃ: ২২৪।

২৫. সাহিত্যে ছোটগল্প। ঐ-পৃ: ২০২।

২৬. বিভূতি রচনাবলী। দ্বাদশ খণ্ড (রবি-প্রশস্তি প্রবন্ধ)। মিত্র ও ঘোষ। পৃ: ৩৫০।

২৭. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার। ঐ-পৃ: ৩০।

২৮. সাহিত্যে ছোটগল্প। ঐ-পৃ: ২৪০।

২৯. ছোটগল্পের কথা- রথীন্দ্রনাথ রায়। পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ১৯৯৬। পৃ: ১০৬।

*****

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ছোটগল্প ও বিভূতিভূষণ

ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের কনিষ্ঠতম সন্তান। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের আবির্ভাব সবচেয়ে পরে। কালের দাবি মেটাতে উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের আদর্শে ছোটগল্প রচিত হতে শুরু করে। সাময়িক সাহিত্য পত্রিকার প্রয়োজনেই বাংলা ছোটগল্পের প্রথম অসচেতন বিকাশ। ছোট আকৃতির গল্প রচনা, তথা ছোটগল্প লেখার প্রথম প্রেরণা জুগিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শন (১২৭৯বঙ্গাব্দ, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ) পত্রিকা। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম ছোট আকারের গল্প 'ইন্দিরা' লিখলেন প্রথম বর্ষের বঙ্গদর্শনে, (১২৭৯)। ১২৮০ সালে বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হলো 'যুগলাঙ্গুরীয়'। দু'টোই উপন্যাসধর্মী রচনা কিন্তু উপন্যাস নয়; আবার ছোটগল্পও নয় -বড় গল্প।

"প্রথম সার্থকনামা বাংলা ছোটগল্পও আবির্ভূত হয়েছিল বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠাতেই। গল্পটির নাম 'মধুমতী', প্রকাশকাল ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস ('বঙ্গদর্শন', ২য় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা)। গল্পের নীচে লেখকের নাম লিখিত আছে শ্রী পূঃ-ইনি ছিলেন বঙ্কিম সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'মধুমতী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থনামা ছোটগল্প কিন্তু তা স্রষ্টার অবচেতন মনের রচনা। বঙ্গদর্শনে রচনাটিকে উপন্যাস নামে পরিচিত করা হয়েছে।[১] ভাবি ছোটগল্পের বীজ এই মধুমতী (১৮৭৩) নামক গল্পের ভেতরই নিহিত ছিল।

'মধুমতী'র পরে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য গল্প হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভিখারিণী'। ১২৮৪(১৮৭৭) সালের ভারতী পত্রিকায় (শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা) গল্পটি প্রকাশিত হয়।[২] 'ভিখারিণী' রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম গল্প। গল্প হিসেবে একেবারেই কাঁচা। তবুও 'ভিখারিণী' বাংলা ছোটগল্পের জন্মলগ্নের সার্থক স্বভাব-পরিচায়ক গল্প।

এরপর রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'ঘাটের কথা' (১২৯১) এবং 'রাজপথের কথা' (১২৯১), ছোটগল্প হিসেবে এ দু'টোও উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম নয়। এর পরে রচিত 'মুকুট'ও (১২৯২) ছোটগল্প নয়। ১২৯৮ সালে 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত ছয় বা সাতটি গল্প নিয়েই রবীন্দ্রনাথের তথা বাংলা সাহিত্যেরও ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত।[৩] ১২৮০ সাল থেকে ১২৯৮ বাংলা সালের আগে পর্যন্ত এই আঠারো বছরকে বাংলা ছোটগল্পের প্রস্তুতি যুগ বলা যেতে পারে। বাংলা ছোটগল্পে গল্প-শৈলীর উৎকর্ষ এলো ১২৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন 'হিতবাদী' পত্রিকায় একের পর এক ছোটগল্প লিখতে লাগলেন অন্ত:প্রেরণার উৎসার বশে, তখন থেকে। বাংলা ছোটগল্পকে সচেতন শিল্পাঙ্গিকে বিন্যস্ত করার বৈজ্ঞানিক আকাঙ্ক্ষায় 'সাহিত্য' (১৮৯০) সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি ১২৯৮ বাংলা সালে তাঁর বাড়িতে এক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করেছিলেন। সে সভায় প্রমথ চৌধুরী একটি ফরাসি গল্পকে বিশ্লেষণ করে সার্থক ছোট গল্পাঙ্গিকের পরিচয় দিয়েছিলেন। 'সাহিত্য' পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরীর 'ফুলদানি' গল্পটি। প্রমথ চৌধুরীর অনুসরণে তখন বাংলা সাহিত্যে অজস্র ফরাসি গল্পের অনুবাদ হতে থাকলো। ওদিকে পদ্মাপার থেকে রবীন্দ্রনাথ 'হিতবাদী' পত্রিকার জন্য একের পর এক প্রতি সপ্তাহে গল্প লিখে পাঠাচ্ছেন। সেটিই বাংলা ছোটগল্পের আদিপর্ব।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথই হচ্ছেন আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের প্রথম মুক্তিদাতা। সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকার মাধ্যমেই তাঁর ছোটগল্প রচনার সূচনা। 'হিতবাদী' পত্রিকায় মাত্র ছয় বা সাতটি গল্প লেখেন। একই বছরেই প্রকাশিত সাধনা (১৮৯১) পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের প্রায় চল্লিশটি গল্প। 'ভারতী' (১৮৭৭) ও 'সবুজপত্র' (১৯৪১) পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয় অনেকগুলো গল্প। 'ভারতী' পত্রিকাই সম্ভবত সর্বপ্রথম ছোটগল্প রচনার পৃষ্টপোষকতা করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের ন-দিদি স্বর্ণকুমারীদেবী 'ছোট ছোট গল্প' নাম দিয়ে তাঁর গল্পগুলোর সংকলন করেছিলেন। এ সব গল্পের বেশ কয়েকটি রবীন্দ্র ছোট গল্পের পরবর্তী। কয়েকটি অবশ্য রবীন্দ্রপূর্ব রচনা।বঙ্কিম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৮৩৪-১৮৮৯) দু'টোমাত্র গল্প লিখেছিলেন; উপন্যাস অভিধায় 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট'(১৮৭৭) এবং 'দামিনী'(১৮৯৩)। এঁদের দু'জনের লেখাই 'ছোট ছোট গল্প'-সার্থক ছোটগল্প নয়; কিন্তু ছোটগল্পের পূর্বাভাস।

বাংলা সাহিত্যে স্বর্ণকুমারী দেবীই (১৮৫৫-১৯৩২) প্রথম সচেতন ছোটগল্প শিল্পী। 'নবকাহিনী'(১৮৯২) তাঁর গল্পগ্রন্থ। তাঁর ছোটগল্পগুলোর মধ্যে আগা গোড়া স্ত্রীলোকের সুর ধ্বনিত হয়েছে। নারীত্বের স্বভাব বর্ণনাই স্বর্ণকুমারীর শ্রেষ্ঠ পুঁজি। স্বর্ণকুমারীর কোন কোন গল্পে এ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের চমক লক্ষ্য করা যায়।

ছোটগল্প-শিল্পীর দৃষ্টিকোণ ও ঐকৈক-কেন্দ্রিক প্রবণতার পূর্ণায়ত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯) জীবনে, প্রতিভায়, রচনায়। তাঁর 'কঙ্কাবতীতে'(১৮৯২) ছোটগল্পের আভাস উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'বীরবালা' প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ সালে। রচনা প্রকাশ অনুসারে তিনি রবীন্দ্রউত্তর শিল্পী হলেও তাঁর গল্প-চরিত্র, তাঁর জীবন-ভাবনা রবীন্দ্র-পূর্ব গল্পশিল্পেরই প্রতিনিধি। ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা গল্পের প্রথম সার্থক'হিউমারিস্ট'।[৪] রূপক, রূপকথা, উদ্ভট চরিত্র, আজগুবি ঘটনার এমন স্বতঃস্ফূর্ত সহজ লীলা বাঙলা গল্পকারদের মধ্যে আর কারও লেখায় দেখা যায় না।[৫]

ত্রৈলোক্যনাথের ঠিক বিপরীত মেজাজের লোক ছিলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৪৯-১৯১১);ঝাঁঝালো আক্রমণেই ছিল শিল্পীর প্রধান ঝোঁক। লেখক নিজ রচনার পরিচয় দিতেন 'গাল-গল্প' বলে। গল্পের চেয়ে 'গাল' অর্থাৎ বিদ্রূপের তেজস্ক্রিয় অস্ত্রক্ষেপণই ইন্দ্রনাথের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

'ভারতী' পত্রিকায় সে সময়ের অনেক লেখকই ছোটগল্প রচনা করেছিলেন। এ পত্রিকার প্রথম যুগের গল্প লেখকেদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত(১৮৬১-১৯৪০)।নগেন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলোর মধ্যে রোমান্সের প্রাধান্য আছে। সামাজিক কাহিনী রচনাতেও এই রোমান্স দৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। রহস্যকাহিনী রচনা ও চরিত্র সৃষ্টির চেয়েও রোমাঞ্চকর ঘটনা সৃষ্টির দিকেই তাঁর প্রবণতা ছিল বেশি।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের জনক। তাঁর রচনাতেই বাংলা ছোটগল্প প্রথম পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছিল। পদ্মা-বিধৌত উত্তরবঙ্গের পল্লীভূমি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প-তথা প্রথম বাংলা ছোট গল্পের জন্মকে জীবনাশ্রয় দিয়েছিল।[৬]

বাংলাদেশের মানুষ আর প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথকে বিমুগ্ধ করেছিল। গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা তাঁর মনে কৌতুহল ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। তাঁর কাছ থেকে দেখা সেসব মানুষের ছোট খাটো সুখ-দুঃখের কথাকেই নিতান্ত সহজ সরল ভাষায় নিজের মনের সৌন্দর্য মিশিয়ে ছোটগল্পে রূপ দিয়েছেন। মানুষ, প্রকৃতি ও রহস্যালোকের অতিপ্রাকৃত ভাবের বিশেষ প্রভাব দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে। সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের গল্প সংখ্যা ১১৯। গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের নানা ছবি, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনধরা দশা, পারিবারিক বিরোধ, স্নেহ-প্রেমের দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও সঙ্কট,নানা ধরনের ধর্মীয়, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সংস্কারের সঙ্গে মানবধর্মের বিরোধ, পরিশেষে মানবধর্মের জয় ইত্যাদি বাঙালি জীবনের নানা ধরনের ছোট বড় কাহিনী বিধৃত তাঁর এসব ছোটগল্পে। বাস্তব জীবন থেকে তিনি তাঁর গল্পের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলো কাব্যধর্মী।তাঁর ছোটগল্পের প্রস্তাবনা, উপস্থাপনা, পরিণতি ও উপসংহার কলাকৌশলের দিক থেকে যেমন বিচিত্র, তেমনি বিষয় ও রসস্ফুরণের দিক থেকেও বৈচিত্র্যপূর্ণ। শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথ 'রবিবার', 'শেষ কথা' এবং 'ল্যাবরেটরি' গল্পে আশ্চর্য বুদ্ধিদীপ্ততার সঙ্গে আধুনিক জীবনের নানা সমস্যার অবতারণা করেছেন। বাংলা ছোটগল্পকে তিনি বিশিষ্ট শিল্পমূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করেন।

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হলো প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬)। 'সবুজপত্র' প্রকাশের আগে আগে একটি মৌলিক গল্প ও একটি ফরাসি গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্প নাটকীয়, চূড়ান্ত মুহূর্ত গুলো (Climax) খরদীপ্ত, কাহিনী দ্রুততালমণ্ডিত। তাঁর ছোটগল্পগুলো গল্প এবং প্রবন্ধসুলভ আলোচনার এক বিচিত্র সঙ্কর।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮৬৯-১৯২৯) ছিলেন 'সাধনা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। আশ্চর্য সুন্দর গল্প লিখেছেন তিনি। তাঁর জীবনপ্রীতি ছিল নিবিড় এবং নিরন্তর। সুধীন্দ্রনাথের গল্পে উপজীব্য ঘটনা বা কাহিনীবর্ণনায় নির্দিষ্ট কোন দেশকালের ছাপ পড়ে নি। মানুষের তুচ্ছ অথচ চিরন্তন বৃত্তি ও প্রবৃত্তি সমূহই সুধীন্দ্রনাথের গল্পে অনায়াস-ধৃত হয়েছে। বর্ণনার উচ্ছ্বাস বা আতিশয্য কোথাও নেই, প্রকাশে নেই আবেগ-কম্পনজনিত কুঞ্চন। ঋজু অথচ নিরাভরণ ভাষা সরল স্বচ্ছন্দ গতি; কিন্তু সার্থক সংক্ষিপ্তির গুণে মর্মস্পর্শীও।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও (১৮৭১-১৯৫০)বেশ কিছু গল্প লিখেছিলেন। ছোট বড় গল্প মিলিয়ে প্রায় চুরানব্বইটি গল্প লিখেছেন তিনি। অবনীন্দ্রনাথের সকল গল্পের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে 'artist's fancy'। তাঁর কোন গল্পই বিশিষ্টার্থে ছোটগল্প নয়, অথচ সব গল্পই সার্থক গল্প। অবীন্দ্রনাথের গল্পে

Dhaka University Institutional Repository

স্পষ্ট বা অস্পষ্ট আকারে ছবি আঁকার খেলাই প্রধান। এক অর্থে তার প্রায় সব গল্পই ছোটদের গল্প। 'ঘরোয়া'য় অবীন্দ্রনাথের গল্পরসের জমাট রূপ দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন-'প্রাণের মধ্যে প্রাণ রক্ষিত হয়েছে'।[৭]

পরবর্তী গল্পলেখকদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) উল্লেখযোগ্য। প্রভাতকুমারের স্বক্ষেত্র হলো ছোটগল্প। তাঁর গল্পগুলোর ঘটনাবৈচিত্র্য, কৌতুক পরিহাস, সমস্যামুক্ত সহজ জীবনের ছবি এবং স্নিগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর খ্যাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। প্রভাতকুমারের গল্পগুলোর প্রধান রস রঙ্গ ও কৌতুক।

'মন্দির'(১৩১০)গল্প নিয়ে সাহিত্য সমাজে আবির্ভূত হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। তাঁর ছোটগল্পের সংখ্যা খুবই কম। গল্প রচনায় তিনি চরিত্র সৃষ্টির দিকে বেশী মনযোগী ছিলেন। তিনি ছিলেন জীবনসন্ধানী শিল্পী। তাঁর 'মহেশ' গল্পটি সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য গল্প। তিনি সার্থক গদ্যশিল্পী হলেও সিদ্ধকাম ছোটগাল্পিক ছিলেন বলে মনে করা হয় না।

'ভারতী' গোষ্ঠীর গল্পশিল্পীদের বয়োঃপ্রধান চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮)। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রানুরক্ত। রবীন্দ্রানুরক্ত কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে অসামাজিক প্রণয় চিত্রণের দক্ষতায় চারুচন্দ্র এককালে 'কুখ্যাত' হয়েছিলেন। তিনি ষোলটি গল্পসঙ্কলনের রচয়িতা। কবিত্বময় সূক্ষ্ম ভাবানুভূতিসম্পন্ন জীবনবীক্ষণই তাঁর ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য।

বাংলা হাসির গল্পের ইতিহাসে রাজশেখর বসুর (পরশুরাম) (১৮৮০-১৯৬০) আত্মপ্রকাশ এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর 'বিরিঞ্চি বাবা' গল্প প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বিচিত্রমুখী বিস্ময় প্রতিভার অধিকারী ছিলেন রাজশেখর বসু। সংযমস্নিগ্ধ রসিকতা ও বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। ধর্মের মিথ্যাচার, অলস ভাববিলাস, ভণ্ডামি প্রভৃতিকে তিনি জ্বালাহীন কৌতুকের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করে সমাজ ও জীবনের বিচিত্র অসঙ্গতি উন্মোচন করেছেন। অধিকাংশ গল্পেই পরশুরামের শিল্পসৃষ্টির মূল উপাদান পরিবেশ রচনার দক্ষতায়। এক বিশেষ প্রকরণের হাসির গল্প রচনায় পরশুরাম আজও অনন্য, অবিস্মরণীয়।

১৩২২-১৩২৯ বঙ্গাব্দ সময়কালে 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়(১৮৮৮-১৯২৯)। মৌলিক গল্পের চেয়ে বিদেশি গল্পের 'ভাব' নিয়ে গল্প লেখার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। বাস্তব জীবনচিত্রণের দুঃসাহসিকতার পরিচয় তাঁর কিছু গল্পে রয়েছে। তাঁর রচনারীতিতে সূক্ষ্মতা আছে, শিল্পবোধ আছে, কিন্তু অভিজ্ঞতা নেই। তাঁর অধিকাংশ গল্পই রোমান্সধর্মী।

Dhaka University Institutional Repository

'ভারতী' গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০-১৯৬৪)। তাঁর গল্পরসিক স্বভাবের মধ্যে ছিল অনায়াসমুক্ততা। একান্ত গুরুগম্ভীর বেদনাবহ জীবন-চিত্রণেও গল্প-শিল্পীর এই অনায়াস সিদ্ধি প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সহজ ভূষণ হয়েছিল। ব্যঙ্গাত্মক রচনারীতির পরিচয়ও তাঁর গল্পে রয়েছে।

জীবনের প্রত্যক্ষদর্শী গল্পলেখক জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)। তাঁর গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য 'কাহিনীর কঠোর দুঃখময়তায় এবং রচনারীতির বিদ্রূপ ইঙ্গিতপূর্ণ সংক্ষিপ্ত স্পষ্টতায়'। মনোবিকৃতির ঘটনা তাঁর গল্পগুলোর বিশেষত্ব। বাংলা সাহিত্যে জগদীশ গুপ্ত অবচেতন মনের গতির প্রথম শক্তিমান শিল্পী। তাঁর রচনার প্রধান গুণ নির্মম নিরাসক্তি। তাঁর কাহিনীর নায়কেরা সাধারণতঃ নিচু শ্রেণীর মানুষ। এক দুর্বার অনিবার্য নিয়তিবাদ তাঁর কাহিনীর মূল সুর। এক অন্ধশক্তি মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা করে। তাঁর গল্পে মানুষ যেন এক অন্ধশক্তির পুতুল।

এ কালে আরও অনেক খ্যাত, অল্পখ্যাত ছোটগল্প লেখকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের বিচিত্রমুখী গল্পসম্ভার বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। সে সময় ছিল বাংলা ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সরলাদেবী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী, মাধুরীলতা, ইন্দিরা দেবী, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র ঘটক, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গল্পকারগণ বিচিত্রমুখী বহু গল্প লিখেছেন। এর পরেই আসে কল্লোল যুগ।

কল্লোল যুগের গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মনীন্দ্রলাল বসু, মনীশ ঘটক, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ কুমার সান্যাল, সরোজ কুমার রায়চৌধুরী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, শিবরাম চক্রবর্তী, বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কল্লোল' যুগের পূর্ববর্তী মানুষ (১৮৯৪-১৯৫০) হয়েও 'কল্লোল' যুগেই তিনি সাহিত্যকর্ম রচনায় ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু, তিনি কল্লোল যুগের লেখকও নন। কালের দিক থেকে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও শৈল্পিক অভ্যুদয় 'কল্লোল' ইতিহাসের সমান্তরালবর্তী; সেই তরঙ্গক্ষুব্ধ ঐতিহাসিক আলোড়নের চরম লগ্নে। কিন্তু সবকিছুর মধ্যে থেকেও শিল্পী বিভূতিভূষণ সমস্ত কিছুর অতীত ছিলেন। কল্লোলের কালের আঙ্গিক সচেতন, জীবন জটিলতায় ভারাক্রান্ত আত্মখণ্ডিত জীবনের পথে বিভূতিভূষণ ছিলেন স্বপ্নলোকে নিবদ্ধদৃষ্টি এক আনমনা পথিক-স্বপ্নলোকের ভারহীন স্বাদ আর অধরা সুরভিতে সমগ্র চেতনাকে প্রত্যয়স্নিগ্ধ খুশিতে ভরে বিদায় নিয়েছেন-বিশশতকীয় জীবনের পঙ্কপঙ্কলে যিনি মানসসরোবরের শিল্পদূত।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

কল্লোল-কাল-কুরুক্ষেত্রের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সজনীকান্ত দাস বিভূতিভূষণের অভিনব সৃজনকর্মের মূল্য নির্দেশ করেছেন- 'তিনি যেন মানসসরোবর হইতে শীতঋতু যাপনের জন্য আমাদের এই পঙ্ককর্দম ও শৈবাল লাঞ্ছিত পুষ্করিণীতে অবতরণ করিয়াছিলেন, এখানকার ঝাঁকে মিশিতে পারেন নাই। আমরা শুধু দেখিলাম, বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক নবশুচিতা ও সহৃদয়তার আমদানি করিলেন। আমরা দীর্ঘ বিরোধ ও কঠিন প্রতিবাদের দ্বারা যাহা করিতে পারি নাই, বিভূতিভূষণ অবলীলাক্রমে শুধু দৃষ্টান্তের দ্বারা সাহিত্যের সেই চিরন্তন সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন।'[৯]

১৩০১ সালের ২৮ ভাদ্র, ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪, বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় কাঁচড়াপাড়া হালিশহরের কাছে মুরাতিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। পিতাঃ মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতাঃ মৃণালিনী দেবী। পিতামহঃ তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৈতৃক নিবাস বনগাঁর অন্তর্গত বারাকপুর গ্রামে। আদি নিবাস বসিরহাটের অন্তর্গত পানিতরে। মহানন্দ পৈত্রিক ব্যবসা কবিরাজি ছেড়ে কথকতা আর পৌরহিত্য করে বেড়াতেন। উত্তরাধিকারসূত্রে বাবার এ আদর্শ পেয়েছিলেন বিভূতিভূষণ।

১৯২০ সালের ২১জুন বিভূতিভূষণ সোনারপুর-হরিনাভি স্কুলে অ্যাসিসট্যান্ট (সহকারী) টিচার হিসেবে যোগদান করেন। এ স্কুলে শিক্ষকতা করার সময়ই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের অন্তপ্রকাশ ঘটে। সেটা অবশ্য চক্ষুলজ্জার খাতিরে, সৃষ্টি প্রকাশের তাগিদে নয়। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে সাহিত্যের আসরে বিভূতিভূষণের আগমন 'উপেক্ষিতা' গল্পের মাধ্যমে। স্থানীয় বালক কবি পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী (প্রকৃত নাম যতীন্দ্রমোহন রায়)র পাল্লায় পড়ে তিনি প্রতিদিনের রাজপুর থেকে হরিনাভির ছায়াময় নিভৃত পল্লীপথে যাতায়াতে যে গ্রাম্যবধূকে দেখেন পথের পাশের পুকুরে স্নান সেরে কলসি কাঁখে বাড়ি ফিরতে, তাঁকে নিয়ে লিখলেন 'পূজনীয়া' নাম দিয়ে একটি গল্প। একান্তই আকাস্মিকভাবে (১৯২১ সালে) লেখা এ গল্প ১৩২৮ সালে মাঘ মাসে (১৯২২জানুয়ারি) 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'উপেক্ষিতা' নামে। এটিই বিভূতিভূষণের প্রথম প্রকাশিত গল্প। এই প্রথম গল্পেই বিভূতি ভূষণের মৌলিক চিন্তাধারা এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। প্রকৃতি-চেতনা, মানব মমতা এবং পরলোক সচেতনতা--- তাঁর সাহিত্যের এ তিনটি বৈশিষ্ট্যই 'উপেক্ষিতা'য় বর্তমান।[১০] এ কারণেই 'উপেক্ষিতা' গল্পটি বিভূতিভূষণের সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। 'উপেক্ষিতা' তাঁর সাহিত্যের সিংহদ্বার, ছোটগল্পের সূচীপত্র।[১১]

১৯২২ থেকে ১৯৫০ সাল- এই আটাশ বছর বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের রচনা কাল। সর্বমোট তিনি দু'শো উনিশটি (২১৯) গল্প লিখেছেন। গল্প সঙ্কলন মোট ১৯ টি। 'উপেক্ষিতা'র পরে ১৩২৯ সনে শ্রাবণ সংখ্যার প্রবাসীতে 'উমারাণী' নামে তাঁর আর একটি গল্প প্রকাশিত হয়। ১৩৩০ (১৯২৩) সনের অগ্রহায়ণ মাসে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় তৃতীয় গল্প 'মৌরীফুল'। ক্রমে ক্রমে তিনি আরও গল্প লিখতে লাগলেন এবং তা প্রকাশিত হতে লাগলো। অবশ্য ততদিনে তিনি হরিনাভি স্কুলের চাকুরি ছেড়ে দেন (১৯২২ সালের ১৭ জুলাই)। এর পর কেশোরাম পোদ্দারের 'গোরক্ষণী সভার'

Dhaka University Institutional Repository

প্রচারকের চাকুরি নেন এবং নানা স্থানে ঘোরেন। এতে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং একের পর এক গল্প লিখে যেতে থাকেন।

বিভূতিভূষণ সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন একটু দেরিতে এবং অন্তরের প্রেরণায় নয়; একান্তই বাইরের তাগাদায়। চক্ষুলজ্জার খাতিরে। গল্প নিয়েই তিনি সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেন। তিনি যখন সাহিত্য রচনায় ব্রতী হলেন তখন 'কল্লোল'-'কালি কলমের' যুগ। সে যুগ ছিল বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট ঘটনাবহুল ও সৃষ্টিশীল। 'কল্লোল' -'কালি কলম'-এর তীক্ষ্ণতায় বাংলার প্রগতিবাদী তরুণদের ছিন্নমূল আধুনিকতা এক ধরনের আশ্রয় পেয়েছে।[১২] যুগযন্ত্রণার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ যেমন বিভূতিভূষণকে ছুঁতে পারে নি, তেমনি তিনিও কালের সে উত্তাল স্রোতে অবগাহন করে নিজকে ভাসিয়ে দেন নি। নদীতীরের রাখাল বালকের মত তীরে তীরেই বাঁশি বাজিয়েছেন, কিন্তু স্রোতে ভাসেন নি।

401576

বিভূতিভূষণ যখন ছোটগল্প নিয়ে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন, তখন বাংলা ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ। অনেক ভাঙ্গা-গড়ার শেষে ছোটগল্পের একটা কাঠামো দাঁড়িয়ে গেছে। যুগের দাবিতে তখন চলছে বিষয় নির্মাণের খেলা। কিন্তু তিন দশকের মধ্য ভাগে পৌঁছেও বিভূতি ভূষণ শুধু সেই বিষয়কেই নিজের সাহিত্যের উপাদানে চিহ্নিত করেন যে বিষয়ে তাঁর পরিপূর্ণ আস্থা আছে, যে বিষয় তাঁর নাগালের মধ্যে আছে। তাই সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্যার সমাধান বাতলানোর সাহিত্য তিনি লেখেন না। কখনোই তিনি ভাবেন না, মজুরদের জীবন নিয়ে লেখার কথা। তিনি অবিচল থাকেন তাঁর 'কিন্নরদলে'র সত্যে। এই অবিচলতায় শিল্পীর আত্মবিশ্বাস এবং সততাকে নিশ্চয় পড়ে নেওয়া যায়। সে বিশ্বাসের সঙ্গে, সে সততার সঙ্গে দ্বন্দ্বের তো কোন বিরোধ নেই।[১৩]

বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো যুগের থেকে আলাদা বিভূতিভূষণ সাহিত্যে স্বতন্ত্র। এর কিছু কারণ রয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কথকের বেশে তাঁর সাহিত্যের আসরে আগমন। অন্য দিকে পল্লীগ্রামে, শহর থেকে দূরে বসবাস। 'গোরক্ষণীসভা'র প্রচারকের কাজে বেশ কিছু কাল গ্রামে-গঞ্জে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। এ কারণে বাংলা ছোটগল্পের হাত ধরে পায়ে পা মিলিয়ে তালে তালে তিনি চলতে পারেন নি। পিছিয়ে পড়েছেন না বলে, বলা চলে তিনি অন্য পথে হেঁটে চলেছেন। তিনি পথের কবি, পথিক কবি। তাই নিজের পথ নিজেই তৈরী করে নিয়েছেন। প্রমথনাথ বিশী বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে বলেছেন- "বর্তমান বাঙালি লেখগণের সকলেরই রচনা স্বকাল ও স্বসমাজ দ্বারা চিহ্নিত, কিন্তু বিভূতিভূষণের অধিকাংশ রচনায় যেন দেশকালের কৈবল্য ঘটিয়াছে, সে সব যে আজকার ঘটনা, তাহা বিশেষভাবে বুঝিবার উপায় নাই। তাঁহার রচনায় কোকিল ডাকিতেছে তাহা শুনিয়া মনে পড়ে 'বাংলাদেশে' ছিলাম যেন তিনশ বছর আগে।"[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৯২২ সালের ১৭ জুলাই হরিনাভির স্কুলের চাকুরি ছেড়ে তিনি মাড়োয়ারি কোটিপতি ব্যবসায়ী কেশোরাম পোদ্দারের 'গোরক্ষণী সভা'র প্রচারকের চাকুরি নেন। কয়েক মাস প্রচারকের কাজ করার পর পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ বাড়িতে তৎকালীন মালিক সিদ্ধেশ্বর ঘোষের মাতৃহীন ভাগিনেয় বিভূতিভূষণ বসুর গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন।সে ১৯২৩ সালের ১ জানুয়ারি।[১৫] তারপর কলকাতাতেই সিদ্ধেশ্বর ঘোষের জমিদারি সেরেস্তায় চাকুরি করেছেন। তারপর খেলাতচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের ভাগলপুর জঙ্গলমহালে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়ে গেছেন বিহারে। ১৯২৪ সালের ২৪ জানুয়ারি রওনা হয়ে তিনি ভাগলপুর আসেন।[১৬] ভাগলপুর যাওয়ার পর পরিচয় হলো উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম জীবনে ভাগলপুরে ছিলেন। এখানে তাঁর মামাবাড়ি। সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ তরুণদের নিয়ে তিনি একটি সাহিত্যিক বিনিময়ের আসর গড়ে তুলেছিলেন। সে আসরের অনেক লেখকেরই প্রথম আত্মপ্রকাশ 'ভারতী' পত্রিকায়। এই আড্ডার সাথে উপেন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল। বিভূতিভূষণ যখন ভাগলপুরে, তখন এই আড্ডার দলপতি ছিলেন রায়বাহাদুর অমরেন্দ্রনাথ দাস।[১৭] বিভূতিভূষণ থাকতেন ভাগলপুরে সদর কাছারির আস্তানা মোগশর পল্লীর 'বড়বাসা' নামক বাড়িতে। সাহিত্যিক এই আড্ডা ছিল সেখান থেকে মাইলখানেক দূরে। তিনি এসে সেটা খুঁজে বের করলেন এবং নিয়মিত যাতায়াত শুরু করলেন।

এই সাহিত্যিক আড্ডাকে ঘিরে বিভূতিভূষণের সাহিত্যচর্চা গতিপ্রাপ্ত হয়। কয়েক বছর তিনি জনমানবশূন্য এ অরণ্যে কাটান। এখানেই তিনি 'পথের পাঁচালি'র পরিকল্পনা করেন এবং লেখা শুরু করেন। ইতোমধ্যে লিখলেন চারটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প 'মেঘমল্লার', 'অভিশপ্ত', 'নাস্তিক', 'পুঁইমাচা'। 'প্রবাসী' পত্রিকায় যথাক্রমে প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৩০, আষাঢ় ১৩৩১, পৌষ ১৩৩১, মাঘ ১৩৩১ সংখ্যায়। ইতোমধ্যে বেরিয়েছে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকা (১ আষাঢ় ১৩৩৪)। 'পথের পাঁচালি' বিচিত্রায় ধারাবাহিক ভাবে বেরুনো শুরু হয় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা থেকে। তার আগে 'বউ চণ্ডীর মাঠ' এবং 'নব বৃন্দাবন' যথাক্রমে বিচিত্রার শ্রাবণ ১৩৩৪ এবং বৈশাখ ১৩৩৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[১৯] 'ঠেলাগাড়ী' গল্পটি প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা'র কার্তিক ১৩৩৫ সংখ্যায়।[২০] বিভূতিভূষণের প্রথম গল্পসঙ্কলন তখনও বেরোয় নি। প্রথম গল্পসঙ্কলন 'মেঘ মল্লার' প্রথম প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে (১৯৩১ সালে)।[২০] অবশ্য এর আগের বছর 'খুকীর কাণ্ড' গল্পটি প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৩৭)।[২১] 'মেঘমল্লার' গল্প সঙ্কলন হিসেবে প্রকাশের আগে মোট ১১টি গল্প প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ১০টি গল্প 'মেঘমল্লারে' অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উপেক্ষিতা, মেঘমল্লার, উমারাণী, পুঁইমাচা, অভিশপ্ত, নাস্তিক, ঠেলাগাড়ি, খুকীর কাণ্ড, বউচণ্ডীর মাঠ, নব বৃন্দাবন। 'মৌরীফুল' গল্পটি পরবর্তিতে 'মৌরীফুল' গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত হয় (১৩৩৯ ভাদ্র, ১৯৩২)। এটি বিভূতিভূষনের দ্বিতীয় গল্প সঙ্কলন। এতেও দশটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয় (মৌরীফুল,জলসত্র,রোমাঞ্চ,রাক্ষসগণ, হাসি, প্রত্নতত্ত্ব, দাতার স্বর্গ, ঝুঁটিদেবতা, গ্রহের ফের, মরীচিকা)। 'মৌরীফুল' এর অধিকাংশই গল্পই বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে রচিত। তখনও তিনি সুনির্দিষ্ট কোন শিল্পপন্থা খুঁজে পান নি, নানাবিধ টেকনিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু, ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব, ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, ১৯২০ সালে শুরু অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনা রাজনৈতিক জীবনে গভীর নৈরাশ্য এবং সমাজ জীবনে হতাশা বাঙালিকে অনিবার্যভাবে বাস্তবমুখী করে তুললো। শিল্পবিপ্লবের ফলে বাংলাদেশে যন্ত্রের প্রসার হতে শুরু করে। সভ্যতার ভারকেন্দ্র তখন ক্রমশঃ গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত। বিরাট বিরাট অট্টালিকার পাশে গড়ে উঠেছে খোলার চালের বস্তি, শহরের গায়ে শহরতলী, ধনীকের সঙ্গে শ্রমিক ও মাঝখানে কেরানী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়ে এক মিশ্রিত মধ্যবিত্ত সমাজ। জীবিকার টানে এই শহরবাসী শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের সঙ্গে জীবনে ও ঐতিহ্যে পল্লীর যোগাযোগ ছিল - দুর্গাপুজোয় এবং পালাপার্বণে, পৈতৃক ভিটে এবং জমিজমা দেখার ব্যাপারে পল্লীতে তাঁদের যাতায়াত ছিল। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের হাতেই বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি। এক দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা - সভ্যতা - সাহিত্যের অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ ও শহুরে বণিক-ধনিক সভ্যতার আর্কষণ, অপরদিকে পল্লীমাটির ও ঐতিহ্যের প্রতি এতদিনের নাড়ীর টান- এই দোটানার মধ্যে সেদিন বাঙালির সাহিত্যিক মানসও দ্বিধাবিভক্ত, অস্থিরও।[২৩]এ সময় একদিকে গভীর হতাশা,অপর দিকে নৈতিক ও সমাজজীবনের মূল্যহীনতা তৎকালীন বাঙালিকে অনিবার্যরকমে বাস্তবাদী করে তোলে। একদিকে কার্ল মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, অন্যদিকে ফ্রয়েডের যৌনতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত তরুণ সম্প্রদায়ের উত্তেজনা ও বিদ্রোহ আরও উগ্র, অনমনীয় ও অস্থির হয়ে উঠলো। সবকিছুর উপরই তখন চিন্তাশীলদের সংশয়, অনাস্থা, অবিশ্বাস। সে সময়ের সাহিত্যে এসব চিন্তাধারারই প্রভাব পড়ে। বাংলাসাহিত্য বাস্তবতার প্রতিকূলতা- অনুকূলতায় বিক্ষুব্ধ ও বিপন্ন। এই উত্তেজনার মাঝখানেই বিভূতিভূষণের নি:শব্দ আগমন এবং সবার অলক্ষিতেই অবস্থান।

"আধুনিকতার লক্ষণ ও সীমা বলতে আমরা সাধারণত: তাই বুঝি, যা কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত, অন্তত:মুক্তি প্রয়াসী।"[২৪] বিভূতিভূষণের সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে এই দেশ কালের চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। তার পরও তিনি স্বতন্ত্র। আলাদা। তার প্রধান কারণ, আত্মভোলা এ পথিক মানুষটি ছিলেন নগরতাবিমুখ। বেশিরভাগ সময়ই ছিলেন গ্রামে-জঙ্গলে-বনে-বাদাড়ে। বর্তমান বিশ্বের দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ তরঙ্গের অভিঘাত তাঁকে ছোঁয় না । তাই তাঁর সাহিত্যে-গল্পে পাওয়া যায় শান্ত-সমাহিত ভাব।

আধুনিক সমাজ নিয়ে বিভূতিভূষণ খুব কমই লিখেছেন। মেটাফিজিক্যাল বা বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবীর বাইরের জগৎ তিনি সন্ধান করেছেন আজীবন। আধ্যাত্মিকতা এবং আধিভৌতিকতার প্রতি সহজাত দুর্বলতা ছিল তাঁর। "ছোটগল্পেই বিভূতিভূষণের স্বকীয়তার ছাপ সুপ্রকট।..... বিভূতিভূষণের রচনায় ছোট ফ্রেমে ছোট ঘটনা, ছোট মাপের চরিত্র এবং ছোট ছোট সুখ-দুঃখের অলৌকিক চিত্র ফুটে উঠেছে।"[২৫] তারাপদ মুখোপাধ্যায় আরও বলেছেন "বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ নতুনত্ব এনেছেন দুই ভাবে। এক. তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর তাঁর রচনায় সহনীয় হয়েছে। দুই. শিশু মনকে শিশুর মত সরলতায় ও সমবেদনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। রচনার সহৃদয়তা এবং অকৃত্রিমতার গুণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় চিরস্মরণীয়।"[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

বিভূতিভূষণের গল্প সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনামূলক। যেন কথকের ঢঙে গল্প বলে গেছেন। কাহিনীর বা ঘটনার চমক কিংবা দ্বন্দ্ব-সংঘাত-জটিলতা কম। চিন্তার গভীরতা এবং বিশ্লেষণ কম।"বিভূতিভূষণের গল্পের উদ্ভাস মুহূর্তগুলি কিন্তু ঘটনা-সংঘাতের ফলে সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টি হয় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য থেকে, অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি থেকে। এই অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্ত হয়ে থাকে একটা সূক্ষ্ম, অতি অন্তরঙ্গ অথচ স্বত:স্ফূর্ত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ।..... এগুলির উদ্দেশ্য রোমান্স সৃষ্টি নয়, পাঠককে চমক লাগিয়ে দেওয়াও নয় পাঠকের দৃষ্টিকে অতি সহজে জীবনের বহিরঙ্গ থেকে জীবনের অন্তর্লোকে পৌঁছে দেওয়া।"[২৭] পাঠক চমতকৃৎ হন, আবেগমথিত হন । গল্পের চরিত্ররা হয়ে ওঠে পাঠকের একান্ত আপনজন । পাঠক অনুভব করেন নির্মল আনন্দ । শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলেছেন- "গল্পগুলির আসল মজা এই যে এদের মধ্যে কোথায় গল্প পাঠক বুঝতে পারে না, তবে শেষ করবার পরে একটি পরিপূর্ণ গল্পপাঠের তৃপ্তিতে পাঠকের মন খুশি হয়ে ওঠে। প্রস্তুতি নেই, পরিণতি নেই, এ্যারিস্টটলের প্রসিদ্ধ সূত্র আদি-অন্ত-মধ্য নেই, তবে যা আছে সকল রচনার কাব্যবস্তু; তৃপ্তিদায়ক পরিপূর্ণতার রস।[২৮]

১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসের পর বিভূতিভূষণ ভাগলপুর থেকে কলকাতায় আসেন।[২৯] ১৯২৯ সালে বাংলার শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছেন সিদ্ধেশ্বর ঘোষ প্রতিষ্ঠিত স্কুল খেলাত চন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশনে।[৩০]

১৯৪১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় বারো বৎসর এখানে চাকুরি করলেন।[৩১] ইতোমধ্যে বন্ধু সজনীকান্ত দাসের অনুরোধে 'চিত্রলেখা' নামে একটি চলচ্চিত্র বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন বিভূতিভূষণ। ১৯৩০ সালের ১৫ নভেম্বর, শনিবার প্রথম প্রকাশ। সম্ভবত: এটি বাংলা সিনেমা সংক্রান্ত প্রথম পত্রিকা। ১৮টি সংখ্যা প্রকাশের পর আর্থিক কারণে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।[৩২]

বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে যুগ-জীবনের অস্থির আবর্তের মধ্যে পড়ে কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি গোষ্ঠী যখন বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎকে সংশয় আর সংঘাতে দিশেহারা করে ফেলেছেন, সেই সময় জীবন ও সাহিত্যের শাশ্বত সঙ্গীত নিয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছেন একতারা হাতে পথের কবি বিভূতিভূষণ। শহর তার ভালো লাগে নি কখনও। সময় এবং সুযোগ পেলেই তিনি ছুটে যেতেন গ্রামে, পাহাড়ে, জঙ্গলে। মিশতেন সাধারণ মানুষের সাথে। মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে থেকে শুঁকতেন মাটির অদ্ভুত সুবাস। ঘটনাচক্রে অশোক গুপ্ত নামে এক বিলাতফেরৎ শিক্ষাব্রতীর কাছ থেকে মাত্র পাঁচশত টাকার বিনিময়ে ঘাটশিলায় এক বাড়ি কিনলেন সুবর্ণরেখা নদীর ধারে। প্রথম স্ত্রী গৌরীর স্মৃতি রক্ষার্থে শালবীথি-ঘেরা, ঘাটশিলার ডাহিগড়ার এ বাড়ির নাম দিলেন 'গৌরীকুঞ্জ'। কলকাতার জনারণ্য ছেড়ে মঝে মাঝে এখানে এসে আশ্রয় নিতেন এবং অবকাশ যাপন করতেন। শালবনে সাহিত্য রচনা করতেন। অন্যান্য সাহিত্যিকদেরও সমাগম হত এখানে। পুরোদমে চলতো গল্প, উপন্যাস লেখা। এদিকে ১৯৩৮ সালে গ্রামের সইমাদের পোড়োবাড়িটা কিনে মহালয়ার আগের দিন রেজিস্ট্রি করে নিলেন। কোথায় যেন সবার অজ্ঞাতে শহর থেকে পালানোর পথ তৈরী হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১৩৪৬(আষাঢ়) সনে বিভূতিভূষণকে সম্পাদক করে 'লিপিকা' নামে একখানা সাহিত্যপত্র বের করেন গোপাল ভৌমিকসহ একদল তরুণ।

Dhaka University Institutional Repository

শহুরে ছকে বাঁধা জীবন ক্রমশ: অসহ্য হয়ে উঠেছিল তাঁর। "মাটিতেই জন্ম, মাটি তাই রক্তে মিশেছে।" শহর ছেড়ে পালানোর জন্য তৈরি হচ্ছিলেন ভেতরে ভেতরে। স্কুলমাস্টারির দাসত্বের জোয়াল কাঁধ থেকে নামিয়ে স্বাধীন জীবন-যাপন করার চিন্তা মাথায় এলো। সব ছেড়ে গ্রামে একেবারে স্থায়ীভাবে বসবাস আর নিয়মিত লেখা। ইতোমধ্যে সে ইচ্ছে জানিয়ে স্ত্রীকে চিঠি দিলেন। ১৯৪১ সালের পহেলা ডিসেম্বর তিনি স্কুলের চাকুরি ছাড়লেন।

১৯৪২ সালে চলে এলেন বারাকপুরে। নিজেদের পুরনো ভিটের পাশেই সইমাদের যে ঘরসুদ্ধ বাড়িটা কিনে রেখেছিলেন - সেটাকে সংস্কার করেই সংসার পাতলেন। আর দু'হাতে লিখতে লাগলেন গল্প, উপন্যাস। উপকরণ তাঁর চারপাশেই ছড়ানো।

জামির কসাতির বউকে নিয়ে লিখলেন 'আহ্বান' গল্প। পুঁটিদির মেয়ে পাঁচিকে (অন্নপূর্ণা) নিয়ে লিখেছেন 'নসুমামা ও আমি' গল্প । এই পাঁচির জীবন নিয়েই লিখেছেন অন্য আর একটি গল্প 'ডাকপাড়ি'। কোলাঘাট থেকে কলকাতা আসার ট্রেনে কল্যাণীর দিদি মায়ার সুটকেস বদল হওয়ার ঘটনা নিয়ে লিখলেন 'বাক্সবদল'। 'গোরক্ষিণী সভা'র প্রচারকের কাজের সময় আগরতলার মহারাজার অতিথিশালায় পরিচয় হওয়া পাগলা ভূ-তাত্ত্বিককে নিয়ে লিখলেন 'থনটন কাকা' গল্পটি। ইতোমধ্যে লেখা হয়েছে 'নবাগত', 'তালনবমী' গল্পগ্রন্থ। 'আহ্বান' ছাড়াও অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে হাসি, পেয়ালা, পৈতৃক ভিটা, কালী কবিরাজের গল্প, রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ প্রভৃতি গল্প লিখেছেন। এ সব কাহিনীর অধিকাংশই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নেয়া। চারপাশের দেখা জগৎ, চেনা জীবনকে তিনি রূপ দিয়েছেন সাহিত্যে। বেঁধে রেখেছেন তার গল্পের ফ্রেমে। তাই তাঁর গল্পগুলো এত বাস্তবানুগ।

বাংলা ছোটগল্প আজ যথেষ্ট সমৃদ্ধ। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ছোটগল্প নিজস্ব একটা ফর্ম খুঁজে পেয়েছে। এতে সবচেয়ে বেশি অবদান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। আর সেই ধারাকে গতিশীল রেখেছেন পরবর্তী ছোটগল্পকারগণ। বিভূতিভূষণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন। তিনি নতুন কোন ধারার প্রবর্তক নন। তবে স্টাইলটা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। কথকের ঢঙে তিনি গল্প বলে গেছেন। আধুনিক ছোটগল্পের যে মূল বৈশিষ্ট্য পরম কোন মুহূর্ত সৃষ্টি, বলা চলে বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে প্রায় তা অনুপস্থিত। কিন্তু সহজ সরল আবেগময় ভাষায়ও কাহিনী সৃষ্টিতে বিভূতিভূষণ অনন্য। তাঁর অধিকাংশ গল্প বর্ণনামূলক। অনেক গল্পে ছোটগল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্যই অনুপস্থিত। তবুও সুখপাঠ্য । তাঁর বর্ণনা হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, গল্পের চরিত্র হয়ে ওঠে পাঠকের আপনজন। এসব কারণেই বিভূতিভূষণের ছোটগল্প বাংলা ছোটগল্পের ভুবনে নিজস্ব স্থান গড়ে নিতে। সংখ্যায় তাঁর ছোটগল্পের পরিমাণ কম নয়, ২১৯টি। অবশ্যই তা বাংলা ছোটগল্পের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। ইত্যাকার কারণে বিভূতিভূষণের ছোটগল্প বহুলভাবে আলোচনার দাবিদার।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ছোটগল্প ও বিভূতিভূষণ

তথ্য সূত্র

১। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার - শ্রী ভূদেব চৌধুরী। মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৯। পৃঃ ৪৮।
২। ঐ-পৃঃ ৫৩।
৩। ঐ-পৃঃ ৫৬।
৪। ঐ-পৃঃ ৬৯।
৫। ছোটগল্পের কথা - রথীন্দ্রনাথ রায়। পুস্তক বিপণি। পৃঃ ৭২।
৬। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার। ঐ - পৃঃ ৮৬।
৭। ঐ- পৃঃ ১৫০।
৮। ঐ- পৃঃ ৫৭৩।
৯। ঐ- পৃঃ ৫৬২।
১০। বিভূতিভূষণঃ জীবন ও সাহিত্য - সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্যায়ন। ১৯৯৫। পৃঃ ১৭।
১১। ঐ - পৃঃ ২৫২।
১২। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - রুশতী সেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ১৯৯৯। পৃঃ-১৮৭।
১৩। ঐ - পৃঃ ১৯৬।
১৪। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প - প্রমথনাথ বিশী। ভূমিকা।
১৫। আমাদের বিভূতিভূষণ - রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৌসুমী পালিত। পৃঃ ২৬।
১৬। ঐ - পৃঃ ২৭।
১৭। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - রুশতী সেন। পৃঃ ১৭৯।
১৮। বিভূতি রচনাবলী। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। প্রথম খণ্ড। পৃঃ ৪৪৩।
১৯। ঐ - পৃঃ ৪৪৩।
২০। ঐ - পৃঃ ৪৪৩।
২১। ঐ - পৃঃ ৪৪৩।
২২। বিভূতি রচনাবলী। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। দ্বিতীয় খণ্ড। ভূমিকাঃ(৩)।
২৩। বিভূতিভূষণঃ জীবন ও সাহিত্য - সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৩৬।
২৪। ঐ - পৃঃ ৩৭।
২৫। বিভূতি রচনাবলী। মিত্র ও ঘোষ। ৩য় খণ্ড। ভূমিকা - তারাপদ মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ১১।
২৬। বিভূতি রচনাবলী। মিত্র ও ঘোষ। একাদশ খণ্ড। ভূমিকা - সুমথনাথ ঘোষ।
২৭। বিভূতি রচনাবলী। মিত্র ও ঘোষ। ২য় খণ্ড। ভূমিকা -জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।
২৮। বিভূতি রচনাবলী। মিত্র ও ঘোষ। প্রথম খণ্ড। ভূমিকা। পৃঃ ৪৯।
২৯। বিভূতিভূষণঃ জীবন ও সাহিত্য - সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৩৪।
৩০। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপধ্যায় - রুশতী সেন। পৃঃ ১৭৮।
৩১। আমাদের বিভূতিভূষণ - রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৌসুমী পালিত। পৃঃ ৪০।
৩২। ঐ - পৃঃ ৪২-৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

বিভূতিভূষণের ছোটগল্প

কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ স্বকালে থেকেও যেন অন্যকালের, তবে স্বকালবিরোধী নন। তিনি যেন দেশ-কাল রহিত। দেশ-কালের উর্ধ্বে। তবে স্বাতন্ত্রসৃষ্টিকারী। উপন্যাসের চেয়ে মনে হয় গল্পই যেন তাঁর স্বক্ষেত্র। বিপুল সংখ্যক গল্পের মধ্যে খুব কম গল্পই শিল্প সাফল্য লাভ করেছে। সার্থক বা উৎকৃষ্ট গল্পের সংখ্যা খুবই কম। তবুও বাংলা ছোটগল্পসাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন এবং স্বতন্ত্র একটা ধারার সৃষ্টি করেছেন, যে ধারার পথিকৃৎ তিনিই এবং তিনিই একমাত্র লেখক।

গ্রামবাংলাকে জানতে হলে, গ্রামবাংলার জনজীবন, মানুষ, প্রকৃতিকে জানতে হলে বিভূতিসাহিত্য পাঠের বিকল্প নেই। তাঁর উপন্যাসের বিশাল পটভূমিতে অনেক সময় অতি তুচ্ছ বিষয় ধরা যায় না। ছোটগল্পগুলো যেন তাঁর চারপাশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তুচ্ছ জীবনখণ্ড। জীবন যেন এখানে ভাঙ্গা, খণ্ড খণ্ড, টুক্‌রো টুক্‌রো দর্পণে বিম্বিত ম্রিয়মাণ আলোকণা। ছোটগল্পগুলো এই সব জীবনেরই বিম্বিত রূপ। সে জীবনকে জানার জন্য, উপলব্ধির জন্য বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের মূল্যায়ন অনিবার্য।

বিভূতিভূষণের বিপুল সংখ্যক ছোটগল্পের বিশেষ বিশেষ কিছু গল্পের বিষয় বৈচিত্র্য ও শিল্পসাফল্য আলোচনা করে লেখকের স্বাতন্ত্র্য ও সার্থকতার অন্বেষণ করা যেতে পারে। বিভূতিভূষণের ছোটগল্পকে তাই 'বিষয়' ও 'শিল্পরূপ' এ দুই পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

ক. বিষয়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২২ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত আটাশ বছরে উনিশটি গল্পগ্রন্থে মোট দু'শো উনিশটি(২১৯) ছোটগল্প রচনা করেন।[১] বিভূতিভূষণের অধিকাংশ গল্পের পটভূমি গ্রামবাংলা। বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি- কান্না, আনন্দ-বেদনার কথা বলেছেন তিনি তাঁর গল্পসাহিত্যে। তাঁর গল্পের মূল বিষয় মানুষ ও প্রকৃতি। তাঁর গল্পসাহিত্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য কম। তিনি ছিলেন গ্রামের মানুষ। চার পাশে যা দেখেছেন তা-ই তাঁর গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। নিত্য চেনা, নিত্য জানা, সাদামাটা জীবনের তুচ্ছ কোন ঘটনা, বিষয় বা বস্তু হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পের বিষয়। তন্ত্রমন্ত্রের প্রতি তাঁর ছিল সহজাত দুর্বলতা। তাই তান্ত্রিকতা বা অতিপ্রাকৃত চেতনা বা আধ্যাত্মিকতা তাঁর বেশ কিছু গল্পের বিষয়। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে জীবনের দার্শনিকতা নিয়ে অধ্যাত্ম বিষয়ক গল্পগুলো গড়ে উঠেছে। মমতা, সহানুভূতি, প্রেম, কৌতুক এবং নিছক জীবনকাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে মানব বিষয়ক গল্পগুলো। প্রকৃতির রূপ ও স্বরূপ নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রকৃতি বিষয়ক গল্পগুলো। তবে প্রকৃতির চেয়ে মানুষই বেশি প্রধান্য পেয়েছে বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে। তার মধ্যে অধিকাংশই গ্রামের মানুষ। এবং সাদাসিধে খুব সাধারণ মানুষ। তুচ্ছ কোন ঘটনা, কাহিনী বা নজর না কাড়া মানুষের কথা হয়েছে তাঁর গল্পের বিষয়। বিভূতিভূষণের সমগ্র গল্পের প্রায় তিন ভাগ জুড়েই রয়েছে সাধারণ মানুষ। বাকি এক ভাগ অন্যান্য বিষয়। এই মানুষকে তিনি আবার দেখেছেন মানবিক মমত্ববোধে। সাধারণ মানুষই হয়ে উঠেছে বিভূতিভূষণের গল্পের প্রিয় বিষয়।

বিভূতিভূষণের এই সাধারণ মানুষরা অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, বেঁচে থাকে। বেশির ভাগ মানুষই অতি দরিদ্র। তাদের চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ তাও খুব ছোট ছোট। বিভূতিভূষণ যেমন কল্লোল যুগের হয়েও কল্লোলিত না হয়ে নিভৃতে সাহিত্য রচনা করেছিলেন, নগর বিমুখ ছিলেন; তাঁর গল্পের মানুষেরাও তেমনি সমাজের এক কোণে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেড়ে উঠেছে। যেন নাগরিক দৃষ্টির বাইরে এক আরণ্যক জগতের মানুষ এরা। নানান কাহিনীতে, বিচিত্র চরিত্রে এদের তিনি গড়েছেন গভীর মমতায়। মনে হয় তিনি গল্প লেখেন নি, তাঁর চারপাশের ঘটে যাওয়া ঘটনাকে লিখেছেন। এই মানবিক মমত্ববোধের গল্পগুলোতে জীবনকে গভীর ভাবে উপলব্ধির কথা রয়েছে। মানবিক মমত্ববোধের গল্পগুলোর মধ্যে অনেক গুলো গল্পেই স্নেহ ও বাৎসল্যের প্রকাশ ঘটেছে। তিনি ছিলেন মাতৃস্নেহের কাঙাল। বিভূতিভূষণের গল্পের নারীরা তাই প্রেমিকা হয়ে উঠতে পারেনি। যেখানে নারী চরিত্র রয়েছে সেখানেই সে মা কিংবা দিদির মমতায় গড়ে উঠেছে। প্রেমিকাও সেখানে স্নেহ আদর দান করে। নারী চরিত্রপ্রধান গল্পগুলোর বেশির ভাগ গল্পেই নারীর করুণাও স্নেহময়ী মূর্তি হয়ে ফুটে উঠেছে। মাতৃস্নেহ নিয়ে রচিত গল্পগুলো হলো--আহ্বান, (উপল খণ্ড), ডাইনী, (কিন্নর দল), হিংয়ের কচুরি, (জ্যোতিরিঙ্গণ), জাল (কুশল পাহাড়ী), রাসু হাড়ি (মুখোশ ও মুখশ্রী), বংশলতিকার সন্ধানে, (অসাধারণ), ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

এদের মধ্যে মাতৃস্নেহ প্রকাশক শ্রেষ্ঠ গল্প 'আহ্বান'। মাতৃস্নেহের পরম প্রকাশ ঘটেছে এ গল্পে। 'আহ্বান' গল্পের জননী বিভূতিসাহিত্যের জননী সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাধিক দরিদ্রা ও অক্ষমা এবং সবচেয়ে রূঢ়ভাবে আহতা। এই সবকিছুর মাঝখানে তার মাতৃহৃদয়ের অনপেক্ষ আহ্বান 'অ-মোর গোপাল, 'যেতে নাহি দিব'র আট {চার বছর} বছরের কন্যাটির আহ্বানের মতো চেতনার গভীর লোক থেকে ধ্বনিত হচ্ছে বলে মনে হয়। গল্পটি বাস্তব কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'আহ্বান' গল্পটি সত্য ঘটনাসঞ্জাত। এইরূপ একটি মুসলমান গ্রামবৃদ্ধার কথা তাঁহার 'উৎকর্ণ' দিনলিপিতে আছে। "বারাকপুর গ্রামের জমীর দেওয়ালির ছেলের সঙ্গে বিভূতিভূষণ এক সঙ্গে পাঠশালায় পড়িতেন। ছেলেটি শৈশবে মারা যায়। বিভূতিভূষণকে বুড়ী ছেলেবেলা হইতে ভালোবাসিত। অনেক বৎসর প্রবাসে অতিবাহিত করিয়া বিভূতিভূষণ গ্রামে ফিরিয়া আসিলে বুড়ী তাঁহাকে দেখিতে আসিত এবং তাহার শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা পাইত।"[৪] বুড়ী মারা গেলে লেখক তার কবরে এক কোদাল মাটিও দেন। গল্পের কাহিনী সামান্য। কিন্তু মাতৃস্নেহের বহিঃপ্রকাশ অসামান্য। সমাজের একপ্রান্তে পড়ে থাকা দরিদ্র ভিখারিনির মাতৃস্নেহকে লেখক মর্যাদা দান করেছেন। 'হিংয়ের কচুরি' গল্পটিতে লেখক সমাজের দৃষ্টিতে নীচ ও পতিতা কুসুমের মধ্যে মাতৃত্বের আবিষ্কার করেছেন। গল্পটি নিঃসন্দেহে অসাধারণ। পতিতা কুসুমের মাতৃহৃদয়ের বিকাশ গল্পটির বিষয়। মাতৃতৃষ্ণার প্রকাশ ঘটেছে এ গল্পে। পঁচিশ বছর বয়েসী কুসুম আট বছরের বামুনের ছেলেকে সন্তানস্নেহে আদর করতো। হিংয়ের কচুরি খাওয়াতো। জ্বর হলে রাস্তার ওপার থেকে লুকিয়ে দেখতো, দু'টো কমলালেবু দিয়ে আসতো। টের পেলে ছেলেটির মা এ জন্যে ছেলেটিকে বকতো। কিন্তু কুসুমের মাতৃহৃদয়ের আহ্বানে ছেলেটি না যেয়ে পারতো না। কুসুমও কখনও কিছুতে তার অমঙ্গল হোক তা চাইতো না। তাই বামুনের ছেলেকে ও পাড়ায় কখনও ভাত খেতে দিত না। মাঝে সাঝে নিজের ঘরে বাজার থেকে কেনা হিংয়ের কচুরি খেতে দিত। দীর্ঘ ত্রিশ বছর দেখা হয় নি। দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর ছেলেটি বড় হয়ে কলকাতায় এসে আবার যখন কুসুমের সাথে দেখা করলো, ঠিকই প্রৌঢ়া কুসুম শাল পাতার ঠোঙায় করে হিংয়ের কচুরি এনে তাকে খেতে দিল। কুসুম হয়তো মনে রেখেছিল এই লোভী ছেলেটার প্রিয় হিংয়ের কচুরির কথা। নিঃসন্তান পতিতা এই মেয়েটিরও রয়েছে মমত্ব, সন্তানের মাতৃতৃষ্ণা; তাই অবলীলায় এক ব্রাহ্মণ ছেলেকে আদর করে গেছে গোপনে সমাজের নিষেধ সত্ত্বেও। বিভূতিভূষণের এই মাতৃত্বসত্ত্বা নিয়ে লিখিত গল্পগুলোর মা চরিত্রটি প্রায়শঃ নিঃসন্তান। হয় বন্ধ্যা, নয়তো সন্তান মৃত। তাই গল্পগুলোর মা চরিত্র এতটা প্রাণবন্ত।

'ডাইনী' গল্পে এক সন্তানহীনা নারীর সন্তানস্নেহ কত তীব্র হতে পারে তারই প্রকাশ ঘটেছে। কমলার সন্তান হয়ে বাঁচে না। তাই পাশের বাসার বিজুর মেয়ে শানিকে আদর করে। বিজুর তা পছন্দ হয় না। সমাজের কুসংস্কার, তাই বিজুর ধারণা কমলা ডাইনী। নিজের সন্তান বাঁচাতে পারে না, অন্যের সন্তানের অমঙ্গলের জন্যও সে দায়ী। স্বামীকে তাই বাসা পাল্টানোর তাগাদা দেয় বিজু। একদিন কমলা শানিকে দেখতে এসে সারাদিন শানিকে কোলে নিয়ে আদর করেছিল। বিজু ভালো চোখে দেখে নি তা। ক'দিন বেশি করে টক লেবু খাবার কারণে হয়তো শানি জ্বরে পড়লো। বিজুর ধারণা ডাইনীর দৃষ্টি পড়েছে শানির উপর। ডাক্তারি ঔষধে অসুখ সেরে গেল। কিন্তু আর যাতে ডাইনীর দৃষ্টি না পড়ে সে কারণে বাড়ি বদলালো। কমলা মাতৃকাতরা এক নিঃসন্তান নারী। তার সে

Dhaka University Institutional Repository

আর্তি 'ডাইনী' গল্পে প্রকাশিত। সন্তানের স্নেহ তাকে ডাইনী করে তুলেছে। নিতান্ত মামুলি কাহিনী হলেও মায়ের সন্তান-বাৎসল্য গল্পটির উপাদেয় বিষয়।

এরকমই আর একটা মাতৃ-স্নেহের গল্প 'জাল'। ঘুরতে ঘুরতে লেখক এসে মায়ার জালে আটকে পড়েছেন ভরহেচ নগর রামলাল ব্রাহ্মণের বাড়ি। বৃদ্ধ রামলালের পুত্রবধূ অনসূয়া বাঈয়ের স্নেহ, আদর লেখককে বেঁধে রেখেছে। তাঁর মাতৃত্বের জালে লেখক আটকে পড়েছেন। ভরহেচ নগর অরণ্য পরিবেশে সন্ধ্যের পরে লেখককে ফটকের বাইরে দেখে অনসূয়া বাঈয়ের উৎকণ্ঠা 'তুমি চলে এসো, শোন আমার কথা' লেখককে মাতৃশাসনের কথা মনে করিয়ে দেয়-"অনসূয়া চলে গেল, কিন্তু আমি তখনি উঠতে পারলাম না। নির্জন জ্যোৎস্না রাত্রের শোভার সঙ্গে মিশে গেল হারানো মায়ের কথা। কি ভালো লাগলো সে রাত্রে অনসূয়া বাঈয়ের স্নেহসিক্ত ওই সামান্য দু'টি কথা।....মা যেমন হারানো সন্তানকে খোঁজে, তেমনি করে অনসূয়া বাঈ খুঁজলে তাদের অর্থবল ও লোকবল দিয়ে আমাকে।"[৫] মায়ের মমতায় কথক জড়িয়ে গেছেন। মাতৃত্বের জাল এ গল্পের মূল বিষয়।

'বংশলতিকার সন্ধানে' গল্পটিতেও মাতৃত্বের ছায়া পড়েছে। যদিও এগল্পের মূল বিষয় নস্টালজিয়া। শৈশবে ছেড়ে যাওয়া গ্রামের টানে পূর্ব পুরুষের মৃত্তিকার খোঁজে প্রবাসী নীরেন এসেছে মায়ের বান্ধবীর বাড়ি। সেখানে নীরেন সইমার কাছে পেয়েছে মায়ের আদর। 'সইমাকে পাইয়া নীরেন যেন হারানো মায়ের সান্নিধ্য বহুদিন পরে অনুভব করিল।..... অনেক দিন পরে যেন হারানো মাকে ফিরিয়া পাইয়াছে, ...শ্যামল বাংলা মা যেন সইমার মূর্তিতে তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাইতেছেন'।[৬] শুধু ছোটগল্পেই নয়, উপন্যাসেও বিভূতিভূষণের নারীরা মূলত 'মা'। মাতৃস্নেহ সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। 'রাসু হাড়ি' গল্পেও দেখি বাড়ির চাকর রাসু রাতে বলদজোড়া নিয়ে উধাও। দু'ভাই রাসুকে খুঁজতে বেরিয়ে নানা জায়গা হয়ে এসে পৌঁছলো জগদানন্দপুর। সেখানে এক বাড়ির বড় বৌয়ের সেবা যত্ন ও আদর দু'ভাইকে অভিভূত করলো। মাতৃস্নেহে সিক্ত করলো তাদের। এ ঘটনার চোদ্দ বছর পর এক দফাদার রাসুকে পাকড়াও করে নিয়ে এলো। তখন অবশ্য ছোট ভাই মারা গেছে। বিচারের বদলে দু'ভাইয়ের মা বলে-'রাসু, দু'টো খাবি? হাঁড়িতে পান্তা ভাত আছে ওবেলার। দু'টো খা - বোধ হয় আজ তোর খাওয়া হয় নি?' 'মা'র ওই কথায় জগদানন্দপুরের দিদির সেই দেবীর মত মূর্তিখানা চোখের সামনে ভেসে উঠলো' বড় ভাইয়ের। "মা চোখ মুছতে মুছতে বললে - আয় বাবা রাসু, ভাত দিইগে, - রান্নাঘরের উঠোনে চল - তোমারও অদেষ্ট- আমাদেরও অদেষ্ট - চল বাবা-"।[৭]

বিচারের বদলে মৃত নেন্টুর মা চোখ মুছতে মুছতে অদৃষ্টের দোষ দিয়ে রাসুকে ভাত দিতে চলে গেল। অভাবী মানুষের সরল হৃদয়ের প্রকাশ প্রকট হয়েছে এ গল্পে। গল্পটিতে মানবিকতা, মহত্ত্ব ফুটে উঠেছে। দুই নারী প্রকৃত পক্ষে দুই মা। মাতৃস্নেহ গল্পটিতে প্রকাশ পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে সন্তানবাৎসল্য নিয়ে লেখা গল্পগুলোতে মুখ্য নারীচরিত্র মূলত, মা হয়ে উঠেছে। মাতৃস্নেহ এ সব গল্পের মূল বিষয়। আর বিভূতিভূষণও মাতৃচরিত্র নির্মাণে সফল।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম্য দরিদ্র জীবন, উপেক্ষিত মানুষ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য তাঁর অধিকাংশ গল্পের বিষয় হলেও তিনি সমাজ ভাঙ্গার ইঙ্গিত করেন নি কোন গল্পে। কার্ল মার্কস এবং ফ্রয়েড তৎকালীন এ দুই চিন্তানায়ক শিল্প-সাহিত্যে যে প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন বিভূতি-সাহিত্যে তা অনুপস্থিত। তিনি তাঁর চারপাশের জীবনকে যে ভাবে দেখেছেন, সে ভাবে উপস্থাপন করেছেন। পায়ে চলা পথের দুধারে ধুলোমলিন জীবন, উড়ে চলা খড়কুটো, তুচ্ছ ক্ষুদ্র বুনোফুল এসবই তাঁর গল্পের বিষয়। নিজে তিনি অলৌকিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে বেশ কিছু গল্পের বিষয় অতিপ্রাকৃত ঘটনা। অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে লেখা গল্পগুলো হচ্ছে-- মেঘমল্লার (মেঘমল্লার), বউচণ্ডীর মাঠ (মেঘমল্লার), নববৃন্দাবন (মেঘমল্লার), অভিশপ্ত (মেঘমল্লার), হাসি (মৌরীফুল), প্রত্নতত্ত্ব ((মৌরীফুল), খুঁটি দেবতা (মৌরীফুল), পেয়ালা (যাত্রাবদল), তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প (জন্ম ও মৃত্যু), তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প (কিন্নর দল), ভৌতিক পালঙ্ক (রূপহলুদ), বিরজা হোম ও তার বাধা (রূপহলুদ), কাশী কবিরাজের গল্প (রূপহলুদ), মায়া (রূপহলুদ), রক্কিণীদেবীর খড়্গ (তালনবমী), ভূত (তালনবমী), অভিশাপ (বিধুমাস্টার), কবিরাজের বিপদ (ছায়াছবি), নুটিমন্তর (ক্ষণভঙ্গুর) পৈতৃক ভিটা (উপলখণ্ড) আরক (নবাগত), ছায়াছবি (ছায়াছবি), টান (অনুসন্ধান), এ অতিপ্রাকৃত গল্পগুলোর কোনটার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা প্রযুক্ত হয়েছে। কোনটার মধ্যে নিছক অবাস্তবতা এবং অলৌকিকতা। অলৌকিকতার মধ্যে তান্ত্রিকতাও রয়েছে কোন কোন গল্পে। এ শ্রেণীর গল্পগুলোর মধ্যে 'মেঘমল্লার' অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। শুধু তাই নয় 'মেঘমল্লার' বিভূতি-গল্পসমগ্রের মধ্যে একটি অন্যতম সার্থক ও উৎকৃষ্ট গল্প। 'বিস্মৃত এক বৌদ্ধযুগের ছায়ান্ধকারে প্রদ্যুম্নের জীবনবোধের গভীরতায় এবং সুনন্দার ব্যর্থ প্রতীক্ষায় এ গল্প বিভূতিভূষণের সাহিত্যে তুলনাহীন সৃষ্টি। বিভূতিভূষণের আর কোন গল্পেই বোধ হয় এমন করে জীবনবোধের নিবিড়তা, ঘটনা-বিন্যাসের নিপুণতা এবং ভাষার সৌন্দর্য সার্থকভাবে মিলিত হয় নি। ইতিহাসের ধূসরতায় আষাঢ়ী পূর্ণিমার তরল অন্ধকারে প্রদ্যুম্নের সংশয়াকুল দৃষ্টিপথে সরস্বতীর আবির্ভাব লেখক কী নিপুণভাবেই নিষ্পন্ন করেছেন। কল্যালক্ষ্মী বন্দিনী সরস্বতীকে মুক্ত করার উদার প্রেরণা ও আনন্দ অনির্বাণ আলোর মতো গল্পের মধ্যে জ্বলছে।[৮] গুণাঢ্যের দেয়া মন্ত্রপূত জল প্রদ্যুম্ন সন্ধ্যাকালে দেবীর গায়ে ছিটিয়ে দিল। দেবী মুক্তি পেল। কিন্তু প্রদ্যুম্ন পাষাণে পরিণত হলো। ওদিকে প্রতীক্ষায় বারানসীতে সন্ধ্যার আকাশে বদ্ধ-আঁখি বাতায়ন পথবর্তিনী তার দুঃখিনী মা, আচার্য শীলাব্রতের কাছে দীক্ষা নিয়ে ভিক্ষু সাজে জ্যোৎস্না রাতে বিহারের নির্জন পাষাণ অলিন্দে বিরহিণী সুনন্দা। প্রতীক্ষা তার হার মানলো না পাষাণের কাছে। এ গল্পের ভেতর স্বার্থ আছে, স্বার্থ ত্যাগের কথা আছে। প্রেম আছে, বিরহ আছে। আছে স্নেহ, মমতা, বিশ্বাস। গুণাঢ্যের কাপুরুষতা আছে, তারুণ্যের উচ্ছলতা আছে। সরস্বতী শিল্প-সৌন্দর্যের প্রতীক। শিল্প মানে আত্মার মুক্তি। সেই আত্মার মুক্তির জন্যই প্রদ্যুম্নের পাষাণ হওয়া। অলৌকিকতার অন্তরালে যেন এক তত্ত্বকথা বলে গেছেন লেখক। অতিপ্রাকৃত গল্পটির বিষয় হলেও কোথায় যেন বাস্তবতার এক সূক্ষ্ম মিশ্রণ রয়েছে, যাতে গল্পশেষে হৃদয়কে ব্যথিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

'মেঘমল্লার' বিভূতিভূষণের রচিত চতুর্থ গল্প। এর পর তিনি অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে বেশ কিছু গল্প লেখেন। লেখক জীবনের প্রথম থেকেই তাঁর অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে গল্প রচনার প্রবণতা দেখা যায়। বিভূতিভূষণের শিল্পীহৃদয়ের গূঢ় যোগাযোগ ছিল কাল-প্রবাহ ও মৃত্যু-চিন্তার সাথে। আর এই মৃত্যু-চিন্তার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে আধ্যাত্মিকতা ও অতিপ্রাকৃত ভাবনা। এই অতিপ্রাকৃত জগৎ বিভূতিভূষণের কাছে নিছক শিল্পসৃষ্টির বৈচিত্র্যময় উপকরণমাত্র ছিল না কোনদিন। এটি তাঁর চিত্তের একান্ত অনুভবের বিষয়, তাঁর হৃদয়ের সরল বিশ্বাস দিয়ে একে তিনি গভীরভাবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রেতলোক ও পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে তাঁর চিত্তের সেই দৃঢ়মূল প্রবণতা ও প্রত্যয় জীবনের পরিণত পর্যায়ে তাঁকে 'দেবযান' নামক বৃহৎ উপন্যাস রচনায় প্রণত করেছিল।[৯] তাঁর বেশির ভাগ অলৌকিক গল্প মূলতঃ ঘটনা নির্ভর। গল্পগুলো গভীর কোন মনস্তত্ত্বভিত্তিক নয়। লেখকের বিশ্বাসই এ গল্পগুলোর ভিত্তিভূমি। তান্ত্রিকতায় তিনি বিশ্বাস করতেন। প্ল্যানচেটে তিনি বিশ্বাস করতেন এবং নিজেও প্ল্যানচেটে বসতেন। কথিত, তিনি নাকি মৃত আত্মার সাক্ষাৎও পেয়েছেন। তাঁর এই নিজস্ব বিশ্বাস চারপাশের জীবনযাত্রার সাথে মিলিয়ে এমন ভাবে তিনি গল্পকে গড়ে তুলেছেন যে পাঠকচিত্তে সহজেই এসব ভীতির শিহরণ জাগিয়ে তোলে। তিনি তাঁর অতিপ্রাকৃত গল্পগুলোতে স্বতস্ফূর্তভাবেই মৃত্যুর শিহরণ জাগানো ভীতি উদ্রেককারী অপার্থিব জগতের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। কোন গল্পে বিভীষিকা প্রকট। কোন গল্পে কম।

'বউচণ্ডীর মাঠ' গল্পে বৃদ্ধ পতিতপাবন চৌধুরীর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী এক রাতে নিখোঁজ হয়ে যায়। এরপর থেকে দুপুরে বনের ধারে বাঁশবনের ছায়ায় কিংবা সন্ধ্যেয় ঝোপের আড়ালে কার চাপা কান্নার সুর শোনা যায়, জ্যোৎস্না রাতে মাঠে সাদা কাপড় পরে কে ক্রমশঃ দূরে চলে যায়- এসব লোকেরা দেখতে পায়। বউচণ্ডী কারো ক্ষতি করে না। সবার মঙ্গল করে। শুভ'র প্রতীক। সাদামাটা নিছক অতিপ্রাকৃত বিষয়ের বর্ণনা। এর মধ্যে ভীতি সঞ্চারের কোন উপকরণ নেই। 'নববৃন্দাবন' গল্পটির বিষয়ও অতিপ্রাকৃত। তবে সামান্য। এর মধ্যে মাড়ি আছে, মড়ক আছে; আছে মহামারীর বিভীষিকা এবং সন্তানস্নেহ। মহামারীতে মৃত একটি পরিবার থেকে পাওয়া ছেলেটিকে কর্ণপুর নিজের সন্তানের মতো বড় করে তুলছে। সেই ছেলেকে কৃষ্ণের দর্শনের আশ্বাস দিলে পথের ধারে সে কৃষ্ণের দর্শন পায়। কর্ণপুরের বৃন্দাবন যাওয়া হয় নি ঠিকই, কিন্তু গৃহী হয়েই সে বৃন্দাবন দর্শন করতে পেরেছে। ভৌতিক কিছু নেই। তবে বিষয়টি অলৌকিক। গল্পটির মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া আছে।

'অভিশপ্ত' গল্পটি রীতিমত ভীতি সঞ্চারক। সম্পূর্ণ অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে লেখা এ গল্পটি যে কোন পাঠককে শিহরিত করবে। 'অভিশপ্ত' বিভূতিভূষণের অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে লেখা গল্পগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। অত্যাচারী জমিদার কীর্তি রায় সম্পত্তির লোভে চক্রান্ত করে বন্ধুর ছেলে নারায়ণকে বন্দি করে রাখে গোপন কুঠুরিতে। পুত্রবধূ টের পেয়ে গোপনে সুড়ঙ্গপথে নারায়ণকে মুক্ত করে দেয়। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিস্বরূপ কীর্তি রায় নিজ পুত্রবধূকে সুড়ঙ্গের দুই পাশ বন্ধ করে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলে। এ ঘটনার প্রতিশোধ নিতে নরনারায়ণ কীর্তি রায়ের গড় আক্রমণ করে। কিন্তু কীর্তি রায় পরিবার পরিজনসহ ধনরত্ন নিয়ে মাটির নিচে গুপ্ত স্থানে আশ্রয় নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্ভাগ্যবশতঃ সেখানে আটকে পড়ে সবাই মারা যায়। সন্দ্বীপ চ্যানেলের খাড়ি বা খালের কাছে গভীর অরণ্যের মধ্যে কীর্তি রায়ের গড়ের বিশাল ধ্বংসস্তূপ। রাত গভীর হলে সেখানে শোনা যায় অনেক লোকের আর্তচিৎকার 'ওগো নৌকা যাত্রীরা, তোমরা কারা যাচ্ছ - আমরা শ্বাস বন্ধ হয়ে মলাম.... আমাদের ওঠাও ওঠাও - আমাদের বাচাঁও'। গল্পটি অসাধারণ এবং মৃত্যুভীতি সঞ্চারক। অতিপ্রাকৃত বিষয়ের সাথে ইতিহাসও গল্পটির উপকরণ।

হাসি (মৌরীফুল) গল্পেরও মূল বিষয় অতিপ্রাকৃত। এটি অবশ্য একটি গল্পের সমান্তরাল অন্য গল্পের অবতারণা । বলা যায় দু'টো গল্প। মূল গল্পের বিষয় গভীর জঙ্গলে গভীর রাতে এক বিকট হাসি। এর চেয়ে অবশ্য গৌণ গল্পাংশটি বেশি লোহমর্ষক। স্টেশনের ওয়েটিং রুমের বাথরুমটার মধ্যে একবার এক ছোকরা সাহেব ইঞ্জিনিয়ার গলায় ক্ষুর বসিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। সেই থেকে রাতশেষে ওই রুমে ওরকম দৃশ্য মাঝে মাঝে দেখা যায়। বিষয়টি অবশ্যই ভয়ঙ্কর এবং ভীতিকর। 'হাসি'র চেয়ে এ বিষয়টি বেশি লোহমর্ষক। প্রত্নতত্ত্ব (মৌরীফুল) গল্পটিতে গভীর রাতে সুকুমার সেনের ঘরে অতীশ দীপঙ্করের আবির্ভাব অলৌকিক। ঢাকা মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি পাথুরে দেবীমূর্তি যা অতীশ দীপঙ্করের খোদাই করা, সেটা উদ্ধারকালে পুরাকালের ঘটনা চোখের সামনে দেখতে পান আচার্য সুকুমার সেন। গল্পের বিষয় অতিপ্রাকৃত কিন্তু ভৌতিক বা ভীতিপ্রদ নয়। খুঁটিদেবতা (মৌরীফুল) গল্পের বিষয় ঠিক অতিপ্রাকৃত নয়, তবে শেষের দিকে সামান্য অলৌকিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পেয়ালা (যাত্রাবদল) গল্পটিও এ ধরনেরই একটি গল্প। মড়কের মেলা থেকে আনা একটা পেয়ালায় যে কিছু খায়, সে-ই মরে। যেন অপয়া। কিন্তু এটা নিছক সংস্কার। গল্পটির বিষয় অতিপ্রাকৃত না বলে সাধারণ জীবন-চিত্র বলা যেতে পারে। পেয়ালাটাকে ঘিরে যে সন্দেহ এবং অশুভ বিশ্বাস এটাই গল্পের বিষয়। এ জাতীয় গল্পের সংখ্যাও কম নয় বিভূতিভূষণের।

অতিপ্রাকৃতে বিভূতিভূষণের বিশ্বাস ছিল বলে সহজাত প্রবৃত্তিতে তিনি অলৌকিক বা ভৌতিক বিষয় নিয়ে গল্প লিখতে পেরেছেন। তিনি তান্ত্রিকতায় বিশ্বাস করতেন। অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে গল্প লিখলেও কয়েকটি গল্পে তার প্রকাশ বা বিভীষিকা সৃষ্টি সবচেয়ে প্রকট। এর মধ্যে 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প' (জন্ম ও মৃত্যু) এবং 'তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প' (পিন্নর দল) উল্লেখযোগ্য। গল্পদু'টো তান্ত্রিকতা নিয়ে রচিত।

'মেঘমল্লার' এবং 'অভিশপ্ত' এরকমই ভয়ানক গল্প । 'তারানাথ তান্ত্রিকের' প্রথম গল্প - তন্ত্রশিক্ষার জন্য তিনি বীরভূমের শ্মশানে এক পাগলির সন্ধান পান। এ পাগলি নিচুশ্রেণীর তান্ত্রিক। নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাগলি এক রাতে তারানাথকে দিয়ে শবসাধনা করায়। কিন্তু ভৌতিক পরিবেশে, চারপাশে নরকঙ্কালের নৃত্যে তারানাথ ভয় পেয়ে শবাসন ছেড়ে দৌড় দেয় এবং অজ্ঞান হয়ে যায়। এ সবই ছিল নাকি পাগলির ভেলকি। তন্ত্রশিক্ষার আচার এবং এর ভয়ঙ্করতা এ গল্পের বিষয়। এরকম বিভীষিকাময় ভৌতিক গল্প শুধু বিভূতিভূষণই নয়, বাংলা সাহিত্যেও কমই আছে।

Dhaka University Institutional Repository

'তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প' এত ভয়ঙ্কর না হলেও কম লোমহর্ষক নয়। তন্ত্রগুরুর সন্ধানে বেরিয়ে একবার তারানাথ বরাক নদীর পারে শালবনে এক তান্ত্রিকগুরুকে খুঁজে পান। তিনি পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে এক দেবীকে আনয়ন করেন। তারানাথ তার কাছে তন্ত্রশিক্ষা করে পার্শ্ববর্তী শালবনে মধুসুন্দরী দেবীকে আহ্বান করে সাধনা শুরু করে। এক সময় তার সাক্ষাৎ পায়ও। কিন্তু, মাস তিনেক পরে তারানাথের বাড়ির লোকজন তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় এবং তারানাথকে বিয়ে দিয়ে সংসারী হতে বাধ্য করে। দু'টো গল্পই রহস্যময়। দু'টোর বিষয় অতিপ্রাকৃত। তন্ত্রমন্ত্র। গল্পদু'টো উৎকৃষ্ট।

অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে লেখা অন্যতম একটি গল্প 'ভৌতিক পালঙ্ক'। রহস্যজনক চিনদেশীয় একটি খাট নিয়ে রচিত এ গল্পটি। সাদামাটা কাহিনীর এ গল্পটি পাঠকচিত্তে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। গভীর রাতে খাটটা মনে হয় নৃত্য করে, তা ঘিরে স্বামী-স্ত্রী অতৃপ্ত দুই আত্মা হাসে - কান্না করে - এ সবই গল্পের ঘটনা। অশরীরী আত্মার উপলব্ধি নিশ্চয় ভীতি-সঞ্চারক। সে হিসেবে গল্পটি পাঠককে আকৃষ্ট করে, পাঠককে নিয়ে যায় এক অতিপ্রাকৃত জগতে।

'বিরজা হোম ও তার বাধা' গল্পটির বিষয়ও অলৌকিক। একটি মেয়ের আরোগ্যের জন্য তান্ত্রিক ভৈরব চক্কোত্তিকে ডাকা হয়েছিল বিরজা হোম করতে। বনজঙ্গলের মধ্যে ভাঙ্গা শিবমন্দিরের ভেতর থেকে একটি মেয়েমানুষ চক্কোত্তিকে বলে উঠলো-'খুকির জন্য বিরজা হোম করবেন না। ও বাঁচবে না।' চক্কোত্তি দমলেন না। রাতে ছাদের ঘরে রান্নার সময় হঠাৎ এক অপদেবতা দেখলেন। বিরাটকায় অসুর কিংবা দৈত্যের মতো। 'মাথাটা একটা ঢাকাই জালার মতো। চোখ দু'টো আগুনের ভাটার মতো রাঙা; আগুন ঠিকরে পড়ছে;..... বিরাট মূর্তি। তাল গাছের মতোই লম্বা।' হোম করা গেল না। মেয়েটি সাথে সাথে মারা গেল। সেই পুরনো প্রথাগত বিশ্বাস গল্পটির উপজীব্য বিষয়। এ গল্পটিও তান্ত্রিকতা নির্ভর। তন্ত্র-মন্ত্র বা আধিভৌতিক বিষয়ে মানুষের আবহমানকালের বিশ্বাসই গল্পটির বিষয়। ঠিক এরকমই আর একটি গল্প 'কাশী কবিরাজের বিপদ' নাম দিয়ে সামান্য ভিন্ন আঙ্গিকে লেখা হয়েছে। এ গল্পটিরও বিষয় তান্ত্রিক কবিরাজি। বিভূতিভূষণের অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে লেখা গল্পগুলোর প্রায় সবগুলোর মধ্যেই কোন না কোন ভাবে তান্ত্রিকতা উপস্থিত থাকে। আর একটা বিষয় স্পষ্ট এ গল্পগুলোর বেশির ভাগই তিনি গল্পের মধ্যে উপগল্প হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। সরাসরি গল্পটা না বলে একটি গল্পের পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে অলৌকিক গল্পটি বলিয়েছেন। এটা লেখকের একটা টেকনিক হতে পারে। আর অতিপ্রাকৃত এ গল্পগুলো কোন গল্পের পাত্র-পাত্রী যখন উপস্থাপন করছেন, সে সময়টা বেশিরভাগ সময়ই বর্ষণক্লান্ত বিকেল, নয়তো বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যা। চাল ভাজা কিংবা মুড়িছোলা বা পুরি এবং চা খেতে খেতে এ গল্পগুলো হয়। যেন এ ধরনের গল্পরস সৃষ্টির জন্য এ রকম রহস্যঘন পরিবেশই দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত গল্প তিনটির বিষয়ের কোন হেরফের বা তেমন কোন বৈচিত্র্য নেই। তান্ত্রিকতা এবং কবিরাজি এর বিষয়। চিকিৎসা করতে যেয়ে অলৌকিক কিছুর দর্শন এবং বাধা পাওয়াই গল্প তিনটির মূল ঘটনা। আঙ্গিকের যা পার্থক্য। উপকরণ একই। বিষয়ও এক। এখানেও তান্ত্রিক কবিরাজির প্রথাগত বিশ্বাস গল্পগুলোকে রহস্যঘন করে তুলেছে।

'মায়া' গল্পটি নিসন্দেহে একটা চমৎকার ভূতের গল্প। এক পথিক চাকুরি খুঁজতে এসে একটা পরিত্যক্ত বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পায়। সেখানে তার থাকা খাওয়ার যাবতীয় নিশ্চয়তা দেয়া হয়। কিন্তু বাড়িতে কিছু অশরীরী-অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায়। ভৌতিক কাণ্ডকারখানা ঘটে। স্থানীয় লোকজন লোকটিকে পালিয়ে যেতে বলে কিন্তু পালাতে পারে না। কী এক মোহ তাকে টেনে রাখে। লোকটি ভৌতিক এ বাড়িটার মায়া ত্যাগ করতে পারে না। কাহিনীটা এরকম। পোড়ো বাড়ি, ভাঙ্গা মন্দির এসব স্থানই যেন অতৃপ্ত আত্মার ঘুরে বেড়ানোর জায়গা। বিভূতিগল্পে তার ব্যতিক্রম নেই। পরিত্যক্ত এ বাড়িটাই 'মায়া' গল্পের উপজীব্য বিষয়। 'পৈতৃক ভিটা' এরকমেরই একটা গল্প। সেখানে বহুকাল পরিত্যক্ত বাড়িতে বিশেষ কাজে এসে রাধামোহন সাক্ষাৎ পান বাড়ির লক্ষ্মীর। ছোট্ট একটি মেয়ে মাঝে মাঝে সঙ্গ দেয় তাকে। বাড়িতে বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে বসবাস করতে বলে, সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাতে বলে। মেয়েটি আসলে প্রায় চল্লিশ বছর আগে মারা যাওয়া তার ছোট পিসি। তার আত্মা বাড়িতেই রয়ে গেছে। যেন পৈতৃক ভিটার দেখাশোনা করার জন্যই সে এ বাড়িকে আগলে রেখেছে। এ গল্পটিরও বিষয় একটি পরিত্যক্ত বাড়ি। বিভূতিভূষণ নিজেই তাঁর পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করে গিয়েছিলেন। এ গল্পটির মধ্যে সেই অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। 'মায়া' এবং 'পৈতৃক ভিটা' দু'টো গল্পেরই বিষয় একই। এর মধ্যে অতিপ্রাকৃত উপাদান রয়েছে। দু'টো গল্পেই দেখি পরিত্যক্ত ভিটার প্রতি বিদেহী আত্মার আকর্ষণ। অতিপ্রাকৃত বিষয়ের অন্তরালে যে বিষয়টি গল্পে মিশে আছে তা হচ্ছে গ্রাম্যজীবন, সাংসারিকতা এবং কিছুটা নস্টালজিয়া। বিভূতিভূষণ আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। প্ল্যানচেটের মাধ্যমে আনতেও পারতেন। বিদেহী আত্মার এই যে পরিত্যক্ত বাড়ির প্রতি আকর্ষণ এর মধ্য দিয়ে পরজন্মবাদের কোন ইঙ্গিত হয়তো করে থাকবেন। বিগত জন্মের অতৃপ্ত আত্মাই হয়তো পরিত্যক্ত ভিটার চারপাশে তাই ঘুরে বেড়াচেছ।

অতিপ্রাকৃত বিষয় অবলম্বনে রচিত গল্প হিসেবে 'রঙ্কিণীদেবীর খড়্গ' গল্পটি উল্লেখযোগ্য। মানভূমের এক পাহাড়চূড়ায় রঙ্কিণীদেবীর ভাঙ্গা মন্দির। দেশে মড়ক হবার আগে দেবীর হাতের খড়্গে রক্তমাখানো দেখা যেতো। দীর্ঘকাল পরে চোরাকুঠুরিতে রাখা মরচে ধরা হাতলবিহীন ভাঙ্গা খড়্গ থেকে রক্ত গড়তে দেখতে পান গল্পের কথক। সেবার গ্রামে কলেরা শুরু হয়। গল্পটিতে অতিপ্রাকৃত উপাদান রয়েছে। কিন্তু ভৌতিক নয়। দেবী এখানে অমঙ্গলের পূর্বাভাস দিয়ে সকলকে সতর্ক করে দিত। বিভূতিভূষণের গল্পে অতিপ্রাকৃত বিষয় এক বিশেষ প্রভাবসঞ্চারী শক্তিরূপে দেখা দিয়েছে। সে শক্তি কোথাও শুভঙ্করী, কোথাও ভয়ঙ্করী। যে সব গল্পে অলৌকিক শক্তি কল্যাণমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে 'রঙ্কিণীদেবীর খড়্গ' তাদের মধ্যে অন্যতম। খুঁটিদেবতা, মেঘমল্লার, বউচণ্ডীর মাঠ, পৈতৃক ভিটা, কাশী কবিরাজের গল্প, এসবেও অলৌকিক শক্তি কল্যাণমূর্তিতে দেখা দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিভূতিভূষণের গল্পে অতিপ্রাকৃত বিষয় অশরীরী সত্তার উপস্থিতি হিসেবে মূর্ত হয়েছে। বেশিরভাগ গল্পেই অতিপ্রাকৃত ভীতির চেয়ে অলৌকিকতার বর্ণনাটাই প্রাধান্য পেয়েছে। অলৌকিকতা প্রাকৃত বুদ্ধির অতীত বলেই অতিপ্রাকৃত। অতিপ্রাকৃত বিষয় সম্পর্কে বিভূতিভূষণের ভাবনা-'জীবনে অনেক জিনিস ঘটে, যাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না- তাহাকে আমরা অতিপ্রাকৃত বলিয়া অভিহিত করি। জানি না হয়তো খুঁজিতে জানিলে তাহাদেরও সহজ ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণ বাহির করা যায়। মানুষের বিচার, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতালব্ধ কারণগুলি ছাড়া অন্য কারণ তাহাদের হয়তো থাকিতে পারে - ইহা লইয়া তর্ক উঠাইব না, শুধু এইটুকু বলিব, সেরূপ কারণ যদিও থাকে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের দ্বারা তাহার আবিষ্কার হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই তাহাদিগকে অতিপ্রাকৃত বলা হয়। তাই বলে অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক বলেই বিভূতিভূষণের সব গল্প ভৌতিক বা ভীতি সঞ্চারক নয়।

'মেডেল' গল্পটি মৃত এক সৈনিকের যুদ্ধে বীরত্বের জন্য প্রাপ্ত একটি মেডেল নিয়ে রচিত, যা কিনা অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটায়। সাদামাটা গল্প। 'মসলাভূত' গল্পটিতে ডুবে যাওয়া জাহাজের মসলার বস্তার অদ্ভুত আচরণ, জীবন্ত প্রাণীর মতো হাঁটা চলা, নৃত্য করা, এসব ভৌতিক বিষয় রয়েছে। মসলার বস্তা অশরীরী আত্মা ভর করে ভূত হয়ে গেছে। 'ভূত' গল্পটি একান্তই একটা সাধারণ ঘটনার বর্ণনা। গল্পটির মধ্যে ভৌতিক কিছুই নেই। গল্পটির বিষয় অতিপ্রাকৃত নয়, সাধারণ গ্রামীণ জীবন ও পরিবেশই গল্পটির বিষয়। বরো বাগাদিনী ঝি গিরি করে সংসার চালাতো। তিন কূলে তার কেউ ছিল না। সে নিখোঁজ হয়ে যাবার পর বাঁওড়ের ধারে বাঁশবনে শেয়াল কুকুরে খাওয়া একটা মহিলার লাশ দেখে গ্রামের সকলের ধারণা হয় সে মারা গেছে। প্রায় দু'মাস পরে জঙ্গলের মধ্যে পাঠশালার ছেলেরা তাকে আবার দেখে ভূত ভেবে ভয় পায়। গুরুমশাইকে নিয়ে আবার জঙ্গলে তা দেখতে এসে দেখে বরো বাগাদিনী সেখানে মরে পড়ে আছে। সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র স্ত্রীলোকের করুণ মৃত্যুই এ গল্পের বিষয়।

'অভিশাপ' গল্পটি একটি স্বপ্ন নিয়ে রচিত। শঙ্করনারায়ণ চৌধুরী পূর্বপুরুষের প্রতি এক নির্যাতিতা নারীর অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য তার একমাত্র পুত্রকে হত্যা করার আদেশ পায় স্বপ্নে বংশের কুললক্ষ্মীর কাছ থেকে। তারপর পুত্রকে হত্যা করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। কাহিনীটি এরকম। জমিদারদের স্বেচ্ছাচার ও পতনই গল্পটির বিষয়, অতিপ্রাকৃত সামান্য একটা হাসি। 'নুটিমন্তর' যাদু বিষয় নিয়ে রচিত। অলৌকিতার পরিবেশ সামান্য। অতিপ্রাকৃত গল্প হিসেবে ভীতি সঞ্চারক গল্প হচ্ছে 'আরক'। বিনায়ক দত্ত সিং এর ঠাকুরদার কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার রাতে নাহারা হ্রদে বালিহাঁস শিকার করতে গিয়ে অপার্থিব রমণীদের দেখে পাগল হওয়া গল্পটির বিষয়। বালিহাঁসগুলো আদপে ছিল অত্যন্ত সুন্দরী অপার্থিব রমণী। তাদের মোহে তিনি প্রতি রাতে হ্রদে যেতেন। একদিন সেই বনহংসীদের ধরতে গেলে সেই অলৌকিক জীবেরা আকাশপথে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই থেকে তিনি উন্মাদ। গল্পটি নিঃসন্দেহে সার্থক। 'ছায়াছবি' এবং 'টান' গল্প দু'টোতেও অতিপ্রাকৃত উপাদান রয়েছে। কাশ্মীর অঞ্চলে গভীর জ্যোৎস্না শীতের রাতে অদৃশ্য দোলনায় এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে দুলতে দেখা যায় 'ছায়াছবি' গল্পে। 'টান' গল্পে হুগলিতে মৃতা এক নারীকে বহু বছর পর নাইরোবিতে এক শ্মশানের কাছে সন্ধ্যেয় গাছ তলায় বসে থাকতে দেখা যায়। এ গল্পটিরও বিষয় অতিপ্রাকৃত কিন্তু ভৌতিক নয়।

Dhaka University Institutional Repository

অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে লেখা বিভূতিভূষণের গল্পগুলোর মধ্যে কোনটা ভৌতিক; কোনটায় অশরীরী আত্মার নীরব উপস্থিতি রয়েছে। দেব-দেবী, গৃহলক্ষ্মী, কূললক্ষ্মীও রয়েছে মঙ্গলদাত্রী হিসেবে। মৃত্যুভীতি-শিহরণ জাগানো লোমহর্ষক গল্প মাত্র কয়েকটি। অতিপ্রাকৃত বিষয় এগুলোর কিন্তু যথার্থ ভূতের গল্প নয়। অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে লেখা এ গল্পগুলোর বেশিরভাগের মধ্যেই রয়েছে তন্ত্র, মন্ত্র, হোম, জপ, বা তান্ত্রিকতা। অসীম অলৌকিক শক্তির কাছে মানুষ নিঃসহায়। তাই এই পুরানো প্রথায় বিশ্বাস। যাদের এ বিশ্বাস (গল্পগুলোতে) তারা প্রায়ই প্রাচীন ও প্রাচীনপন্থী এবং অল্প শিক্ষিত। অতিপ্রাকৃত কিছু গল্পে অবশ্য আধ্যাত্মিকতারও পরিচয় প্রকাশ ঘটেছে। গল্পগুলোর পটভূমিও সাদামাটা গ্রাম-বাংলা; প্রকৃতি এবং গ্রামীণ সহজ-সাধারণ জীবন।

প্রকৃতির সন্তান বিভূতিভূষণ। তাঁর সাহিত্যের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে প্রকৃতি। গল্পের চেয়ে উপন্যাসে প্রকৃতির উপস্থিতি বেশি। প্রকৃতির ভেতরই যেন উপন্যাসের কাহিনী বেড়ে উঠেছে। আর গল্পের ভেতর প্রকৃতি যেন অতিথি হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে। চেতনে-অবচেতনে প্রকৃতি-প্রেমিক বিভূতিভূষণ ছোটগল্পের পটভূমির ভেতর প্রকৃতিকে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতি ও পরিবেশ গল্পের কাহিনীকে লাবণ্য দান করেছে। বলতে গেলে প্রায় সব গল্পেই কোন না কোনভাবে প্রকৃতির বর্ণনা স্থান পেয়েছে। হয়তো গল্পের বিষয় প্রকৃতি নয়, ভিন্ন; অন্য কিছু; কিন্তু তার মধ্যেও প্রকৃতির উপস্থিতি রয়েছে। নিছক প্রকৃতিকে নিয়ে বা শুধু প্রকৃতিকে বিষয় করে লেখা ছোটগল্পের সংখ্যা খুব বেশি নয়। প্রকৃতি বিষয়ক গল্পগুলো হচ্ছে - ছোট নাগপুরের জঙ্গলে (রূপহলুদ), মাকাললতার কাহিনী (অসাধারণ), শাবলাতলার মাঠ (উপলখণ্ড), কনে দেখা (যাত্রাবদল), মড়ি ঘাটের মেলা (নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব), কালচিতি (জ্যোতিরিঙ্গণ), দিবাবসান (জ্যোতিরিঙ্গণ), মানতালাও (কুশলপাহাড়ী), হাট (ক্ষণভঙ্গুর), প্রভাতী (নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব), অরণ্যে (তালনবমী), কুশলপাহাড়ী (কুশলপাহাড়ী), আবির্ভাব (কুশলপাহাড়ী), পিদিমের নিচে (অসাধারণ), এ গল্পগুলোর মধ্যে বিশেষ কোন কাহিনী নেই। আছে প্রকৃতির বর্ণনা।

"বিভূতিভূষণের উপন্যাসে প্রকৃতি যে ব্যাপক ও বিশিষ্ট ভূমিকা পেয়েছে, গল্প-সাহিত্যে প্রকৃতির সেই অনন্যতা নেই, সেখানে মুখ্য ভূমিকা মানুষের। কিন্তু নানাভাবে প্রকৃতি তাঁর গল্পে কিছুটা স্থান করে নিয়েছে ঠিকই। মানুষের ক্লান্তি, ক্লিষ্ট জীবনের প্রকৃতির উপর স্নিগ্ধরূপ বিশল্যকরণীর কাজ করে - অবসন্ন দেহে মনে এনে দেয় শান্তির প্রলেপ।"[১১] বিভূতিভূষণের প্রকৃতিবিষয়ক এ গল্পগুলোকে কোনভাবেই যথার্থ ছোটগল্প বলা চলে না। বলা যায় লেখকের ডায়েরি বা ভ্রমণকাহিনীর অংশ এগুলো। নির্জন পরিবেশে লেখকের নিসর্গ সৌন্দর্য নিরীক্ষণের অনন্য দৃষ্টির নির্ভুল পরিচয়ের স্বাক্ষর এ গল্পগুলো। লেখকের প্রগাঢ় প্রকৃতি-প্রেম সেখানে তুচ্ছ অবহেলিত নিসর্গ উপকরণগুলোকে অসামান্যতা দান করেছে। মর্ত্যের মৃত্তিকার সাথে শত পাকে বাঁধা প্রকৃতি-মায়ের কথা নিয়ে রচিত হয়েছে এ সব গল্প। প্রকৃতি তার স্নিগ্ধতার প্রলেপে আহত মানুষকে শুশ্রূষা করেছে, আশ্রয় দিচ্ছে এ সব গল্পে। মানুষের জীবনের প্রকৃতির স্থান যে কত বড় সবগুলো গল্পেই তা দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

"ছোটগল্পে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-চেতনা তাঁর অন্যান্য লেখার মতো অনেক সময় ঐশী বা ভাগবতী সত্তার দিকে বিসর্পিত নয়, মাটির সঙ্গেই শতপাকে বাঁধা। দার্শনিকতাকে আশ্রয় করে তাঁর প্রকৃতি-চেতনার প্রকাশ হয়েছে গুটিকয়েক গল্পে।"[১২] প্রকৃতির ভাবগভীর অনির্বচনীয় রূপের মধ্যে অধ্যাত্মসত্তার উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে যে গল্পগুলোতে, সে গুলো হচ্ছে 'মাকাললতার কাহিনী', 'প্রভাতী' ও 'কুশল পাহাড়ী'। 'মাকাললতার কাহিনী' গল্পে মাকাললতার সাথে জীবনেরই সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছেন। ক্ষুদ্র মাকাললতার সৃষ্টি-রহস্য ঘিরে লেখকের মনে অধ্যাত্মচেতনার জাগরণ ঘটেছে। 'যিনি অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি মহারুদ্র, তিনিই চিরপ্রাচীন অথচ চিরতরুণ পুষ্পধন্বা দেবতা ..... এ মাকাললতার ঝোপ যেন পবিত্র দেবায়তন, অতি পবিত্র, অতি সুন্দর,। সৌন্দর্যের পূজারী যে, এই দেবায়তনে দেবতার আবির্ভাব সে দর্শন করবে। এখানে জাগ্রত ও প্রত্যক্ষ দেবতাকে নিত্য প্রণাম করবে' (মাকাললতার কাহিনী)। 'প্রভাতী'ও এমনই এক গল্প। প্রকৃতি এক অনির্বচনীয় স্নিগ্ধতায় মুগ্ধ করেছে লেখককে। এখানেও সেই চিরন্তন জীবনের অমরত্বের বাণী 'মন কোথায় নিয়ে যায় সীমাহারা সৌন্দর্যের রাজ্যে, দৈনন্দিন ক্ষুদ্রত্ব ও বন্ধন থেকে মুক্তির সন্ধান যোগায়- যে মুক্তি নিরাসক্তির অমরত্বে ঐশ্বর্যশালী, প্রতিদিনের পরিচিত জগতের বহু দূরে সে লোকাতীত লোকের বাণী মাঝে মাঝে দু'একজন মানুষের কানে এসে পৌঁছায়' (প্রভাতী)। 'কুশল পাহাড়ী'তে অরণ্য পাহাড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝখানে ভৈরবথানের সাধুর মুখ দিয়ে যে বাণী উচ্চারিত হয়েছে তা বেদমন্ত্রের মতো গভীর ও প্রাচীন- "কবিই তিনি বটেন বাবা। এখানে বসে বসে দেখছি। এই শালগাছটাতে ফুল ফোটে, বর্ষাকালে পাহাড়ে ময়ূর ডাকে, ঝর্ণা দিয়ে জল বয়ে যায়, তখন ভাবি কবিই বটে তিনি। আমি কিছু পাই নি বাবা। ভড়ং দেখছো এ সব বাইরের। ভেতরের জ্ঞান কিছু হয় নি। তবে দেখতে চেয়েচি তাঁকে। তাঁর এই কবিরূপ দেখে ধন্য হয়েচি। ..... মুক্তির ধারণা বন্ধন আছে বলেই আসে। যথার্থ বিচারের দৃষ্টিতে মানুষের মুক্তিও নেই, বন্ধনও নেই। ব্রহ্ম এক অচিন রাজ্য, যে যেখানে যায়, সেই বোঝে ব্রহ্ম দ্বৈতও নয় অদ্বৈতও নয়। তিনি শাস্ত্রেরও পারে, বদানুবাদেরও পারে, দ্বৈতবাদের প্রতিপাদ্য নয়, অদ্বৈতবাদেরও প্রাপ্য নয়। অনুভূতিই একমাত্র জিনিস। মানুষ মুক্ত আছেই, কেবল সে সমন্ধে সচেতন নয় সে। মানুষ সদামুক্ত, সে মানুষ। কিছু পড়তে হবে না। কিছু সাধনা করতে হবে না। অনুভূতিই উত্তরায়ণের সেই অভিযাত্রী, যা তাকে পলকে মুক্তির জ্যোতির্লোকে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারে। বিশ্বাস কর বাবা। মানুষ মুক্ত। সে-ই নিজেকে নিজে বেঁধেছে। সে-ই অনুভব করুক সে মুক্ত! সে মানুষ, সে মুক্ত" (কুশল পাহাড়ী)। একটা দার্শনিক তত্ত্ব, একটা সত্য এ গল্পত্রয়ীতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। যদিও তত্ত্বের ভারে গল্প হিসেবে এ গুলোর মান ক্ষুণ্ন হয়েছে।

ছোট নাগপুরের জঙ্গলে, অরণ্যে, দিবাবসান এবং মানতালাও কোন গল্পই নয়। নিছক ভ্রমণকাহিনী বলা যেতে পারে। মিঃ সর্দার সিং এর সাথে দু'দিনের ভ্রমণ নিয়ে লেখা 'ছোট নাগপুরের জঙ্গলে'। 'অরণ্যে' গল্প লেখকের একাকী জঙ্গলে ভ্রমণে বের হওয়া এবং রাতে পথ হারিয়ে বিপদগ্রস্ত হওয়া এবং শেষে বহু কষ্টে ফিরে আসার ঘটনা নিয়ে লেখা।'দিবাবসান'ও একই ধরনের, বনে পড়ন্ত বিকেলের মায়া নিয়ে লেখা ডায়েরির মতো। 'কনে দেখা' গল্পে বৃক্ষপ্রীতির চাটুল্য গল্পটির মান ক্ষুণ্ন করেছে। বৃক্ষের বিয়ের জন্য পাত্রী হিসেবে স্ত্রীবৃক্ষ খোঁজাই গল্পের বিষয়। এর চেয়ে শাবলাতলার মাঠ, হাট ও আবির্ভাব গল্পের মধ্যে বেশ গল্পের উপাদান রয়েছে। 'শাবলাতলার মাঠ' গল্পে লেখকের শিশুকালের প্রকৃতিপ্রেমিক এক শিক্ষকের কথা মনে পড়ে যায়, যিনি সন্ধ্যের সময়ও প্রায়শ:ই ঘন

Dhaka University Institutional Repository

বনের মধ্যে বসে প্রকৃতির শোভা দেখতেন। গল্পটিতে নস্টালজিয়া বিষয়টি রয়েছে। লেখকেরই প্রকৃতিপ্রেম গল্পে উপস্থিত; যেন প্রকৃতিপ্রেমিক ওই শিক্ষক লেখক নিজেই।

'হাট' গল্পে সাধারণ, দরিদ্র গ্রাম্যজীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত। পুরনো হাটের সাথে নতুন হাটের তুলনা, ব্যবসায়ীদের সাংসারিক তুচ্ছ বিষয় আলোচনা - এ সবই এ গল্পের উপাদান। সেখানে প্রকৃতি মা-মাটির মমতায় উপস্থাপিত। 'আবির্ভাব' গল্পে শহর থেকে গ্রামে চলে আসা একটি পরিবারের দুই ভাই দুলাল ও বিমলের বর্ষার দিনে মাঠে মাছ ধরতে গিয়ে কিলবিল সর্প দর্শন এবং ঝাঁকে ঝাঁকে কই মাছের আবির্ভাব বিষয় বর্ণিত। কাহিনীর চেয়ে প্রকৃতি বর্ণনা বেশি। বিভূতিভূষণের বেশির ভাগ গল্পই বর্ণনাধর্মী। সেখানে ঘটনা বা কাহিনী ছাপিয়ে উপস্থিত হয় প্রকৃতি। কখনও কখনও এ প্রকৃতির বর্ণনা গল্পরসের বিচ্যুতি ঘটায়।

প্রকৃতি বিষয় নিয়ে লেখা আর একটা গল্প 'মড়িঘাটের মেলা'। বিষয় প্রকৃতি হলেও এর মধ্যে একটা কাহিনী আছে এবং দার্শনিক তত্ত্বও রয়েছে। গল্পটির পটভূমি প্রাকৃতিক। কিন্তু প্রেক্ষাপট আধ্যাত্মিক। মাঘী পূর্ণিমার দিনে যারা দূরে নবদ্বীপ কিংবা গৌরনগর গঙ্গাস্নানে যেতে সমর্থ নয়, তাদের জন্য এক বুনো সাধু মড়িঘাটে ওইদিনে গঙ্গাস্নান এবং মেলা মিলিয়েছেন। তিনি রটিয়েছেন যে, ওই একটা মাত্র দিনে গঙ্গা ওখানে আসবেন বলে স্বপ্নে তাকে দেখা দিয়েছেন। ফলে হাজার হাজার স্নানার্থীর ভিড় হয় সেখানে। প্রকৃতি নিয়েই গল্পটি রচিত। তবু এর মধ্যে একটা কাহিনী রয়েছে যা গল্প পাঠের আনন্দ থেকে পাঠককে বঞ্চিত করে না। এ গল্পে বুনো বৃদ্ধ সাধু গরিব মানুষের তীর্থস্নানের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য মিথ্যে রটনার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করেন নি। এর পেছনে তাঁর অন্য কোন স্বার্থ বুদ্ধি নেই - আছে কেবল দরিদ্র মানুষের জন্য অপরিসীম দয়া ও মমতা।

এ ধরনের গল্পের আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আপাত তুচ্ছতার আবরণে ঢাকা অতি সরল জীবনের মধ্যে লেখক কর্তৃক ভাব গভীরতার অন্বেষণ ও উপলব্ধি। বিভূতিভূষণের কিছু গল্পে দেখা যায় অধ্যাত্ম অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে অবহেলিত অন্ত্যজ শ্রেণীর গ্রাম্য বুনো মানুষের মধ্যে - সমাজের নিম্নস্তরের শেষ ধাপে যাদের স্থান। 'মড়িঘাটের মেলা' গল্পের সাধু ওই শ্রেণিভুক্ত। 'পিদিমের নিচে' (অসাধারণ) গল্পের সাধুও ওই শ্রেণিভুক্ত। এ গল্পের পাগলঠাকুরও বুনো এবং মড়িঘাটের বুনো সাধুর মতোই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। দু'টো গল্পেরই প্রেক্ষাপট প্রকৃতি। দু'টো গল্পেই তিনি গ্রামবাংলার নিতান্ত সহজ অনাড়ম্বর প্রকৃতি চিত্র অঙ্কন করেছেন।

বিভূতিভূষণের গল্পে অধ্যাত্মচেতনা শুধু সহজ নিসর্গপ্রীতিকে আশ্রয় করেই ব্যক্ত হয় নি, তার প্রকাশ ঘটেছে মানবপ্রীতির মধ্য দিয়েও। মানুষের প্রতি মানুষের সহজ দয়া-মায়া-সেবা ধর্মের পথেও। তার পরিচয় মেলে 'মড়িঘাটের মেলা' এবং 'পিদিমের নিচে' গল্পে। 'পিদিমের নিচে' গল্পে বৃদ্ধ পাগল ঠাকুর একের পর এক কলেরা রোগীর সেবা শুশ্রূষায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। পাগল ঠাকুর মুমূর্ষু রোগীদের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেন। নিছক প্রকৃতিকে বিষয় করে লেখা গল্পগুলো গল্প হিসেবে সার্থক হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের প্রধান বিষয় প্রকৃতি এবং মানুষ - এ দু'টো অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে রয়েছে। প্রকৃতির মাঝেই বেড়ে উঠেছে তার গল্প উপন্যাসের চরিত্ররা। নানা শ্রেণীর মানুষও সেখানে প্রকৃতিরই সন্তান। তাই বলা যায় বিভূতিভূষণের গল্পের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে প্রকৃতি। সেখানে অনাড়ম্বরপূর্ণ প্রকৃতিচিত্রটি এরকম- 'সরাটির চর, কাশবন, ঝিঙেফুলের হলুদ ক্ষেত, নদীতীরে বৃহৎ বটগাছ, প্রথম বসন্তের মাঠে মাঠে ফুটে ওঠা ঘেঁটুফুল, শিমূল, সুবাসভরা লেবুফুল, কাশবনের ঝোপ'..ইত্যাদি।

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের প্রধান বিষয় মানুষ। তার মধ্যে একটা শ্রেণীর মানুষই স্থান পেয়েছে বেশি। সেখানেও শ্রেণিবৈষম্য রয়েছে কিন্তু শ্রেণিচেতনা বা শ্রেণিসংগ্রাম নেই। প্রায় সব ছোটগল্প জুড়েই মানুষ বিশেষভাবে উপস্থিত রয়েছে। এই মানুষেরা আবার উচ্চবিত্তের নয়,মধ্যবিত্তেরও নয়। বেশির ভাগ মানুষই হতদরিদ্র, মুটে, মজুর, ভিক্ষুক, অশিক্ষিত, শ্রমজীবী - খড়কুটোর মতো, আগাছার মতো বেঁচে থাকে ; পড়ে থাকে সমাজের এক কোণে। এদের কোন আক্ষেপ নেই, অভিযোগ নেই, চিন্তা নেই, চেতনা নেই, দ্বন্দ্ব নেই। যেন মৃত্যু নেই বলেই বেঁচে থাকা এদের। এ মানুষের অভাব আছে, চাহিদা নেই; যন্ত্রণার প্রকাশ নেই। জীবনের সাদামাটা জলছবি যেন এঁকেছেন তিনি সাংবাদিকেরে দৃষ্টিতে। প্রায় সবকটি গল্পেই সাক্ষাৎ পাই এই গ্রাম্য, দরিদ্র, অসহায়, ভাগ্যের হাতের পুতুল মানুষদের।

]মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের মানুষেরা অধিকাংশই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে বেড়ে ওঠা শ্রেণিসংগ্রামী। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের মানুষেরা সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর, বঞ্চিত, অবহেলিত। আর বিভূতিভূষণের গল্পের মানুষেরা সহজ-সরল-গ্রাম্য দরিদ্র মানুষ। বিভূতিভূষণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি গল্প 'পুইমাচা'(মেঘমল্লার)। এ গল্পের সহায়হরি একজন সাধারণ দরিদ্র মানুষ। অন্নপূর্ণা, ক্ষেন্তি এরাও তেমনি মানুষ। যার কোন সহায় নেই কেউ হরি ছাড়া, সেই সহায়হরি। যার ঘরে চাল বাড়ন্ত , নাম তার অন্নপূর্ণা। ক্ষেন্তি কত অল্পেই তুষ্ট। 'পথের পাঁচালী'র দুর্গারিই যেন অন্য সংস্করণ ক্ষেন্তি। অন্নপূর্ণা যেন সর্বজয়া, আর সহায়হরি হরিহর রায়। এরকম মানুষই বিভূতিভূষণের প্রায় সব গল্প উপন্যাসে উপজীব্য বিষয় হয়েছে। চরিত্রগুলোর মধ্যে তেমন আত্মদ্বন্দ্বও নেই। প্রায় সবকটি গল্পের মানুষেরা এই সহায়হরি, অন্নপূর্ণা, ক্ষেন্তির আদলে গড়া। বিভূতিভূষণের চারপাশের দেখা নিয়তির হাতের ক্রীড়নক মানুষেরা। 'খুটিদেবতা' (মৌরীফুল) গল্পের রাঘব, নন্দলাল এমনি অভাবী মানুষ। লোভ, স্বার্থ, ছোটখাটো চাহিদা এদের ভেতরের অভাবী মানুষদেরই তুলে ধরে। খুব অল্পতেই এরা আবার তুষ্ট। ছোট ছোট মানুষের ছোট ছোট স্বার্থ, চাহিদা , লোভ, দুঃখ, সুখ বেশিরভাগ গল্পের বিষয়।

Dhaka University Institutional Repository

এরকমই আর একটা চরিত্র 'ভণ্ডুল মামার বাড়ি' (যাত্রাবদল) গল্পের ভণ্ডুল মামা। ইচ্ছে আছে সামর্থ্য নেই। তাই মাস খরচা থেকে সামান্য বাঁচিয়ে বছরের পর বছর ধরে একতলা কোঠা বাড়ি নির্মাণ করার কাজ চলে। তাও শেষ পর্যন্ত অসমাপ্তই থেকে যায়। সাধ সাধ্যের কাছে পরাজিত হয়। কিন্নর দলের 'কিন্নর দল' 'বাটি চচ্চড়ি' এসব গল্পেও এমনই সাধারণ মানুষেরই সাক্ষাৎ পাই।

'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' (নবাগত) গল্পের কৃষ্ণলাল এ জাতীয় মানুষেরই চরম পরাকাষ্ঠা। নতুন ক্যানভাসারদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে উঠতে পারে না প্রৌঢ় দরিদ্র কৃষ্ণলাল। চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে আসে গ্রামে। অভাবে সেখানেও থাকতে না পেরে আবার চলে আসে শহরে। কেউ চাকুরি দেয় না, তাই পেশাগত চর্চা চালিয়ে রাখার জন্য ওষুধ ছাড়াই রাস্তায় দাঁড়িয়ে ক্যানভাস শুরু করে। বড় পীড়াদায়ক এ অসহায়ত্ব। দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর ছোবলে কৃষ্ণলালের মতো বিভূতিভূষণের গল্পের মানুষেরা জর্জরিত। প্রতিকারহীন যন্ত্রণার আবর্তে ঘূর্ণিত। 'ভিড়' (নবাগত) গল্পের গাড়ির কামরার ভিড়ে এ ধরনের অসহায়, হতদরিদ্র, নিম্নবিত্তের মানুষেরই সন্ধান মেলে।

'অসাধারণ' গল্পগ্রন্থে 'অসাধারণ', 'নদীরধারের বাড়ি', 'বিপদ', 'কাঠবিক্রি বুড়ো', 'রূপো বাঙাল', 'তেঁতুলতলার ঘাট', 'তুচ্ছ', 'পিদিমের নিচে', প্রভৃতি গল্পে সমাজের দৃষ্টিতে 'তুচ্ছ' মানুষদের পরিচয় মেলে। 'অসাধারণ' গল্পের সহায় সম্বলহীন রুগ্ণ লোকও তার স্ত্রী যে কিনা স্বামীকে সারিয়ে তুলতে প্রাণান্ত চেষ্টা করে চলছে - তুচ্ছ মানুষ। 'নদীর ধারের বাড়ি' গল্পে পীতাম্বর লেনের দুর্বিষহ জীবনযাত্রা, 'বিপদ' গল্পের হাজুর ক্ষুধা, 'কাঠ বিক্রি বুড়ো' গল্পের কাঠ বিক্রি মুসলমান বুড়োর সদ্য হিন্দু বিধবার দুঃখে অশ্রু বিসর্জন ও সান্ত্বনা প্রদান নিতান্তই ছোটখাটো, মামুলি বিষয়। তবু এসবই বিভূতিভূষণের অধিকাংশ গল্প জুড়ে রয়েছে। 'বিপদ' গল্পের হাজু অভাবের তাড়নায় বেছে নিয়েছে বেশ্যাবৃত্তি। শুধু দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের বিনিময়ে সে অন্যের বাড়ি গতর খাটার কাজও চেয়ে পায় নি। ভিক্ষে করেও পেট চলে না, তার উপর লোকেরা চুরির অপবাদ দিয়ে মারে। অবশেষে সে বেছে নেয় বেশ্যাবৃত্তি। সমাজের দৃষ্টিতে তার অধ:পতন ঘটে। কিন্তু সে পেয়েছে দু'মুঠো পেট পুরে খাবার নিশ্চয়তা। মাঝে মাঝে তার ছেলেকে ও তার মাকে পারছে দু'পাঁচ টাকা পাঠাতে। অথচ একদিন অভাবের কারণে শ্বশুরবাড়ি থেকে তার স্বামী ছেলেসহ হাজুকে ফেলে রেখে গেছে তার মায়ের বাড়ি, যেখানে আরও অভাব।

'রূপো বাঙাল' গল্পের রূপো বাঙাল দরিদ্র অথচ দায়িত্ববান; 'তেঁতুলতলার ঘাট' গল্পে দরিদ্র মা অসুস্থ ছেলেকে গরম ভাত খাওয়াতে পারে নি, পারে নি চিকিৎসা করাতে- অবশেষে অপূরণীয় আশা নিয়ে ছেলেটিরে মৃত্যু, এইসব ছোট খাটো সাধারণ বিষয় বর্ণনার গুণে অসাধারণ হয়ে উঠেছে বিভূতিভূষণের গল্পে। 'তুচ্ছ' গল্পে সামান্য একটু গন্ধতেল দরিদ্র মেয়েটির মাথায় মেখে দেয়ায় মেয়েটি যে অনাবিল আনন্দ লাভ করেছে তা 'পথের পাঁচালী'র দুর্গা বা 'পুঁইমাচার' ক্ষেন্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। মূলত: বিভূতিভূষণে গল্পের পুরুষ চরিত্রেরা প্রায়ই হরিহর রায়ের প্রতিমূর্তি, নারীরা সর্বজয়া আর কিশোরীরা দুর্গারই আদলে গড়া। 'পিদিমের নিচে' গল্পেও গ্রামের একপাশে পড়ে থাকা এক বুনো সাধুর উদারতা বর্ণিত। বিভূতিভূষণের গল্পের মানুষেরা অসৎ নয়, লম্পট নয়; দরিদ্র, সাদা সিধে, সহজ-সরল। সাদামাটা জীবন-যাপনে অভ্যস্ত।

Dhaka University Institutional Repository

'আহ্বান' (উপলখণ্ড) গল্পের জমির কল্লাতির বউ ভিক্ষা করেই বেঁচে থাকে। বলতে গেলে নিঃস্ব,কিন্তু মমতাময়ী। 'ভুবন বোষ্টুমী' (উপলখণ্ড) চরিত্রটিও সাদামাটা। বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়। 'ফকির'(উপলখণ্ড) গল্পের ইঁচু মণ্ডল অত্যন্ত সাধারণ মানুষ। জন দেয় তো খাবার জোটে। ঘরে একবেলার খাবার থাকলে আর কাজে যায় না। দরিদ্র, অসহায়। অর্থাৎ এ নিয়ে তার মাথা ব্যথা নেই। তার বৌ খুন হলে মোক্তার তাকে জেলের ভয় দেখালে ইঁচু বলে, 'বাবু ঝেখানে মোরে রাখে, ঝা করে ক্ষেতি নেই। কিন্তু বাবু আপনি এইটে তাদের বলে দেবেন, ব্যবস্থা করে ঝেন পাঁচ ওক্ত নামাজ আমি সেখানে পড়তি পারি - আর কিছু আমার বলবার নেই বাবু। দারোগাবাবু যখন তাকে বলেন 'জান এতে চালান দিলে তোমার ফাঁসি হতে পারে?' ইঁচু মণ্ডল তখন বলে- 'আল্লার ঝপি তাই মর্জি হয়, মোর মনে এতটুকু খেদ থাকবে না দারোগাবাবু - তেনার ঝা মর্জি তাই তিনি করুক। মুই খুশি ছাড়া অখুশি হবো না'(ফকির গল্প)। ইঁচু মণ্ডলের মতো এরকম নগণ্য ,সাদাসিধে, দরিদ্র, অতি সাধারণ তাঁর গল্পের মানুষেরা।

'বিধুমাস্টার' গল্পগ্রন্থের কয়েকটি গল্পে এ ধরনের বিত্তহীন সাধারণ মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। 'সুলোচনার কাহিনী' গল্পে সুলোচনার মাকে তিনি গড়েছেন অভাবের তাড়নায় হীনরুচি সম্পন্না হিসেবে। বিত্তহীন বৃদ্ধা সুলোচনার মা শেষ জীবনে বেছে নেয় ভিক্ষাবৃত্তি। যেখানে থাকে , সেখানের বর্ণনা-'বাসা দেখিয়া মনে হইল, তেমন ঘরে মানুষ থাকিতে পারে না, গরু থাকিলেও কষ্ট পায়'(সুলোচনার কাহিনী)। 'অভয়ের অনিদ্রা' গল্পে অভয় তার মৃত স্ত্রীকে চিতায় পুড়িয়ে আসার পরে মনে পড়েছে - এক আনা সোনা দিয়ে গড়া তার স্ত্রীর কানের ফুল খুলতে ভুলে যাওয়ায় তাও চিতার আগুনে পুড়ে গেছে। সেই শোকে অভয় ঘুমুতে পারে না। 'স্ত্রীর মৃত্যু সে সহ্য করিতে পারে, কিন্তু এই লোকসানের আঘাত সে ভুলিবে কেমন করিয়া? যতবার সে ঘুমাইতে যায়, ততবারই ঐ ফুল দু'টির হিংস্র উজ্জ্বলতা যেন ধ্বক ধ্বক করিয়া জ্বলিয়া ওঠে মাথায়' (অভয়ের অনিদ্রা)। নগণ্য মানুষের নগণ্য চাহিদা।

'কবি কুণ্ডুমশায়' গল্পের উপেক্ষিত, অস্বীকৃত প্রৌঢ় গ্রাম্য কবি কুণ্ডুমশায় অতি সাধারণ, ছাপোষা মানুষ। কবিতা লেখা বাতিক। জীবনের চেয়ে কবিতা প্রিয় তাঁর কাছে। তাই মৃত্যুর আগে কথককে বলে গেলেন "কবিতার খাতগুলো আপনার হাতে দিয়ে যাবো। বড় আদরের! ছেলেমেয়ে নেই! ওই ছেলেমেয়ে।... আর কোন ভাবনা নেই। মরণে ভয় করি নে, বয়স হয়েছে। এই খাতাগুলো-' (কবি কুণ্ডমশায়)। 'সঞ্চয়' গল্পে অতুল নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থ। মাত্র আঠার টাকা সাত আনার ফাঁকি তাঁকে চিত্রার্পিতের মতো স্তম্ভিত করে তুললো। সামান্য একটা টাকা তাঁর স্ত্রী বিমলা রুমালে বেঁধে রাখতে দিয়েছিল প্রতুলেরই কাছে। বিমলা গত হয়েছে আজ সাত বছর। তার পরবর্তী স্ত্রী সে টাকা পেয়ে খুব খুশি। এই সাধারণ মানুষেরা সামান্যতেই খুশি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

'বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি' (তাল নবমী) গল্পের বামাচরণ এমনি এক সাধারণ মানুষ। 'চাউল' (তাল নবমী) গল্পে এক অসহায় দরিদ্র ভিখারি পিতার দুরবস্থার কথা বর্ণিত। সপ্তাহে মাথাপিছু মাত্র পাঁচ সের চাউলের জন্য ডিনামাইট দিয়ে পাথর ফাটানোর কাজ করে। ব্লাস্টিং করতে গিলে একটি পাথর ছুটে এসে মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দেয়। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে টাটানগর পাঠানো হয়। অনাথ অবস্থায় পড়ে থাকে তার পাঁচ-ছয় বছরের শিশু কন্যা থুপী। বিভূতিভূষণের গল্পের মানুষেরা এই থুপীর মতো অসহায়, থুপীর বাবার মতো উপেক্ষিত।

বিভূতিভূষণের গল্পের মানুষেরা, হোক সে নারী কিংবা পুরুষ, অতিনগণ্য মানুষ; সকলেই সাংসারিক, সামাজিক ক্ষেত্রে, জীবনে কোন না কোনভাবে ব্যর্থ-বঞ্চিত। কোন প্রতিষ্ঠা বা স্বীকৃতি নেই, আর্থিক দুর্গতির অন্ত নেই। অদৃষ্টের প্রহারে ক্লিষ্ট, জর্জরিত। সমাজের নানা অংশ থেকে ভিন্ন শিক্ষা, ধর্ম-বিশ্বাস, জীবিকার নানা মানুষেরা এসে ভিড় করেছে তাঁর গল্পের জগতে। কিন্তু সেখানে কোন শ্রেণিবৈষম্য চোখে পড়ে না। তারা সবাই একই শ্রেণীর। নিচু শ্রেণীর বা জাতের। শুধু গ্রাম্য পরিবেশের গল্পেই এ ধরনের মানুষেরা স্থান পায় নি; নগরজীবনের পটভূমিতেও তিনি যে সব গল্প লিখেছেন সেখানের মানুষেরাও এরকমই নগণ্য, উপেক্ষিত, অবহেলিত। তিনি গ্রামের মানুষ। গ্রামপ্রীতি তাঁর মর্মমূলে। তাই তাঁর চারপাশে তিনি যা দেখেছেন-সাধারণ মানুষ, প্রকৃতি, গাছ-পালা, খাল-বিল, নদী-নালা; যেখানে তিনি তিল তিল করে 'পথের পাঁচালী'র অপু হয়ে বেড়ে উঠেছেন এবং একটু একটু করে যা কিছু মজ্জায় সঞ্চিত করেছেন, হৃদয়ে কুড়িয়ে রেখেছেন তা-ই তাঁর গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। তবুও কর্মসূত্রে নানা শহর, নানা স্থান, বন, জঙ্গলে তাঁকে থাকতে হয়েছে, মাঝে মধ্যে যাওয়া আসা করতে হয়েছে। সে সব স্থানের নানা মানুষ, ভিন্ন প্রকৃতি তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। সেই সব স্থানের মানুষেরাও সমাজের নিচুতলার মানুষ। সেখানেও নগরের আলোকিত ঐশ্বর্যের চোখ ঝলসানো ছবি স্থান পায় নি। কোন বিলাসবহুল জীবনের ছবি তাঁর গল্পে স্থান পায় নি। হত, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত কিংবা বিত্তহীন বা নিম্নবিত্তের মানুষেরা স্থান পেয়েছে তাঁর গল্পে। সমাজের অনাদৃত, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পের বিষয়। এইসব বিড়ম্বিত যন্ত্রণাক্লিষ্ট হতদরিদ্র মানুষকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে বিভূতিভূষণ তিল তিল করে নিবিড় মমতায়, ঐকান্তিক সংবেদনায়, নিষ্ঠার সাথে চিত্রিত করেছেন তাঁর অসংখ্য গল্পে-উপন্যাসে।

বিভূতিভূষণের গল্পের বিষয় হয়েছে প্রকৃতি। কিন্তু, এ প্রকৃতিও লোকচক্ষুর অন্তরালের বিচিত্র বুনো প্রকৃতি। টগর কিংবা গোলাপ তাঁর চোখকে ভোলায় না। তাঁকে আকৃষ্ট করে মুচকুন্দ, ঘেঁটুফুল, তেলাকুচা, মাকাললতা। মানুষের মতো তাঁর প্রকৃতিও উপেক্ষিত, পথের পাশে সাধারণের দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়। তাও তুচ্ছ, ক্ষুদ্র। চোক ধাঁধানো, মনকাড়া বিদেশি ফুল, গাছ নয়; দেশি নগণ্য, সাধারণ সব বুনো ফুল, আগাছা তাঁর গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। আকাশমণি কিংবা বাগানবিলাস তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে নি; তাঁকে মুগ্ধ করেছে নাম না জানা, দৃষ্টির অগোচরে পড়ে থাকা বুনো ফুল, বনফুল, বনলতা। এ যেন তাঁর গল্পের মানুষেরই মতো সবার দৃষ্টির অগোচরেরা।

Dhaka University Institutional Repository

যা কিছু বিভূতিভূষণের গল্পের বিষয় হয়েছে, তার প্রায় সবটাই এরকম তুচ্ছ, সাদামাটা, লোকচক্ষুর অন্তরালের। ক্ষুদ্র, সামান্য বিষয় নিয়ে যে এত চমৎকার গল্প হতে পারে তা বুঝি বিভূতিভূষণের আগে আর কারো চিন্তায় আসে নি। তিনি পথিক কবি, তাই পথের ধুলো তাঁর সাথি হয়েছে; সাথি হয়েছে পথের দু'পাশের নগণ্য, উপেক্ষিত সবকিছুই। তিনি দর্শক নন, মুগ্ধ পর্যবেক্ষক। খুঁটে খুঁটে দেখেছেন জীবনকে। নিত্য দেখা সেই জীবনকে, জগৎকে, প্রকৃতিকে স্থান দিয়েছেন তাঁর গল্পে, সাহিত্যে। তাই তাঁর গল্পের বিষয় এত বর্ণিল, এত বিচিত্র। আর এত সামান্য। সামান্যের মধ্যেই হয়তো তিনি অসামান্যকে খুঁজেছেন।

ক. বিষয়

তথ্য সূত্র

১। বিভূতিভূষণঃ জীবন ও সাহিত্য-সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্যায়ন। ১৯৯৫। পৃঃ ২৫২।
২। ঐ। পৃঃ ২৫৪।
৩। ঐ। পৃঃ ২৬৩।
৪। বিভূতি রচনাবলী। অষ্টম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ। ভাদ্র ১৩৯৪। গ্রন্থ পরিচয়। পৃঃ১১।
৫। বিভূতি রচনাবলী। একাদশ খণ্ড। জাল (গল্প) [কুশলপাহাড়ী] পৃঃ৩৬ ও ৩৬৬।
৬। বিভূতি রচনাবলী। সপ্তম খণ্ড। বংশলতিকার খোঁজে (অসাধারণ)
৭। বিভূতি রচনাবলী। দশম খণ্ড। রাসু হাড়ি (মুখোশ ও মুখশ্রী)
৮। বিভূতিভূষণঃ জীবন ও সাহিত্য - সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ২৬০।
৯। বিভূতিভূষণঃ মন ও শিল্প - গোপিকানাথ রায়চৌধরী। দেজ ১৯৯৬। পৃঃ ১৩৭।
১০। বিভূতি রচনাবলী। নবম খণ্ড। রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ (তাল নবমী)।
১১। বিভূতিভূষণঃ মন ও শিল্প - গোপিকানাথ রায়চৌধুরী। পৃঃ ১৪১।
১২। বিভূতিভূষণঃ জীবন ও সাহিত্য - সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ২৭১।

*****

Dhaka University Institutional Repository

খ. শিল্পরূপ

১৯৯২ সালে 'উপেক্ষিত' গল্পের মাধ্যমে সাহিত্য জগতে বিভূতিভূষণের আত্মপ্রকাশ। এরপর ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি একের পর এক রচনা করে গেছেন অসংখ্য গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, দিনলিপি। তাঁর এ বিপুল কর্মযজ্ঞের বিস্তৃতি ১৯২২ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত।

সাহিত্য সময়, সমাজ ও জীবনের দর্পণ। সাহিত্যিক, শিল্পী যুগের সৃষ্টি হয়েও যুগস্রষ্টা। শিল্প ও সাহিত্য সমকালীন পটভূমিরই নান্দনিক ফসল। তা সমাজ ও যুগচেতনার স্পর্শরহিত নয়। তাই সাহিত্যের এ শৈল্পিক বিচার তার সৃষ্টির কালের পটভূমিতেই করতে হবে। প্রথমত: বিচার্য সাহিত্যে সমাজ ও জীবনচেতনা কতটা প্রতিফলিত। দ্বিতীয়ত: আঙ্গিক ও প্রকরণগত দিক থেকে তা কতটা সফল।

১৯২২ থেকে ১৯৫০ সময়কালটা ভাবনার দাবিদার। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু। সারা পৃথিবী যুগযন্ত্রণায় অস্থির। প্রচলিত মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়লো। পুরনো ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার, নীতিবোধে দেখা দিল সংশয়। বিপরীতমুখী চিন্তা আর তত্ত্বের সংঘাতে উত্তাল বিশ্ব। এমনই এক সময়ে আবির্ভূত হলেন দুই মহান চিন্তানায়ক কার্ল মার্কস ও সিগমুড ফ্রয়েড। সারা বিশ্ব হয়ে পড়লো দ্বিধা বিভক্ত। কার্ল মার্কসের বৈপ্লবিক সাম্যনীতি আর ফ্রয়েডের যুগান্তকারী যৌনতত্ত্ব সারা বিশ্বের শিল্প সাহিত্যে তুললো তুমুল আলোড়ন। পুরনো পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের স্বপ্ন আর স্থির নিশ্চিন্ত আদর্শের সৌধে দেখা দিল সংশয় আর অবিশ্বাসের ফাটল। 'পাশ্চাত্য জীবন ও সভ্যতার এই ঝড়ো বাতাসের ঝাপটা এসে লেগেছে আমাদের আকাশে। আমরাও চঞ্চল বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছি'। "বিশ শতকের বাংলাদেশ। তৃতীয় দশক। জীবনের সমুদ্র তখন তরঙ্গের আঘাতে ক্ষুব্ধ ফেনিল। পুরানো পৃথিবীর প্রচলিত ঐতিহ্য আর বিশ্বাস, মনন আর মূল্যমান একটা প্রচণ্ড ভাঙ্গন আর রূপান্তরের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।"[১]

যুদ্ধকালীন এ সময়ের বাংলা সাহিত্যে জীবনের অবক্ষয়, অবিশ্বাস আর সংশয়ের প্রতিচ্ছবি তাই স্বাভাবিক ভাবেই ফুটে উঠেছে। যুগসন্ধির এ অস্থিরতায় সৃষ্টি হয়েছে কল্লোল-কালি কলম-প্রগতি ইত্যাদি তরুণ লেখক গোষ্ঠীর। স্থির নিশ্চিত কোন বিশ্বাসে এরা বিশ্বাসী নন। অবিশ্বাস, হতাশা, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সংশয় ইত্যাকার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে তারা আন্দোলিত, আলোড়িত, মন্থিত। পুরনোকে ত্যাগ করে নতুন কিছু করার তাগাদা এদের ভাববন্যায়। তাঁরা "জীবনকে কখনও দেখেছেন মার্ক্সীয় সাম্যবাদের দৃষ্টিতে, কোথাও প্রখর বাস্তবতা, কোথাও বা আশাহত আদর্শবাদীর স্বপ্নভঙ্গের বিহ্বলতা।"[২]

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধি ও হৃদয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে পড়লো এ সময়ের সাহিত্য। সাহিত্যের নানা শাখায় দেখা দিল পরিবর্তন। প্রচলিত মূল্যবোধের ন্যায় ভেঙ্গে পড়লো প্রচলিত রূপ, রীতি, প্রকরণ। বাংলা ছোটগল্পেও স্পষ্ট হয়ে উঠলো বিবর্তনের চিহ্ন। যুদ্ধকালীন সময়ে এবং যুদ্ধোত্তর সময়ে মানব মনের প্রচ্ছন্ন সংশয়, নৈরাশ্য, হতাশা, যন্ত্রণা, ব্যর্থতা গল্পে স্থান করে নেয়। দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও ক্ষুধা তীব্রতা পায়; প্রেম, কাম, যৌনতা, সমাজচেতনা সমানভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে গল্পে। ব্যক্তিমানস, সমাজমানস এবং সামগ্রিক জীবনবোধের মূল ধরে নাড়া দেয় যুদ্ধ, মানবতার এ অবক্ষয়ে বদলাতে থাকে বাস্তবতার চেহারা। তরুণ লেখকদের গল্পভাবনায় দেখা দেয় বিষয় ও প্রকরণগত অভিনবত্ব। বাংলা ছোটগল্পও তার স্বভাব পরিবর্তন করে। ছোটগল্পের বিষয় পাল্টানোর সাথে সাথে পাল্টে যায় তার রীতিও। পাল্টায় তার ভাষা, স্টাইল, টেকনিক, শিল্পরূপ। নতুন রূপে আবির্ভূত হয় বাংলা ছোটগল্প।

এক শান্ত, নির্লিপ্ত মহাযোগীর লিরিক সুরের নির্জন অবকাশ নিয়ে "এই বিভ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ প্রাণকল্লোল, সাহিত্যের এই খণ্ড বিশ্বাস আর ক্ষুব্ধ হতাশ্বাস চেতনার পটভূমিতে এসে দাঁড়ালেন বিভূতিভূষণ। অজস্র খণ্ড দৃষ্টির তরঙ্গ মন্থন করে আবির্ভূত হলো এক নতুন সমুদ্রসম্ভব প্রাণ।"[৩] তিনি কল্লোলের কালের হয়েও কল্লোলের নন। যেন প্রত্যূষের নির্জন সমুদ্রসৈকতে বসে শান্ত যোগীর মতো তিনি শুনেছেন মহাসমুদ্রের কল্লোল, কিন্তু গা ভাসান নি তরঙ্গে। "তাঁর দৃষ্টি ছিল একই সঙ্গে একান্ত ভাবে মর্ত্য ও প্রকৃতি প্রেমিকের। মাটির পৃথিবী থেকে উর্ধ্বে, আকাশের নক্ষত্রখচিত বিশাল পটভূমিতে তাঁর মন কীসের যেন অনুসন্ধানী ছিল। ..... সমস্ত দিক থেকে এক সুষম শিল্পের সারল্য ও সহজাত প্রকৃতিকেন্দ্রিক এক আধ্যাত্মিক অভীপ্সা গল্পকার বিভূতিভূষণের ছিল কবচকুণ্ডল।

বিভূতিভূষণের এ বিপুল সংখ্যক ছোটগল্পের মূল্যায়নের প্রক্কালে ফিরে তাকানো প্রয়োজন ছোটগল্পের শিল্পরূপের দিকে। ছোটগল্পশিল্পকে আধুনিকতার কোন্ মানদণ্ডে বিশ্লেষণ করা হয়, তা মাথায় রেখে বিশ্লেষণ করতে হবে বিভূতিভূষণের ছোটগল্পকে। আধুনিক ছোটগল্পের রচনারীতি ও প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের শিল্পরূপ বিচার অভীষ্ট। ব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনার গভীরে প্রবেশ না করে কয়েকটি প্রধান ও মূল বৈশিষ্ট্যকে আলোচনা করে তাঁর ছোটগল্পের শিল্পসাফল্য নির্ণয় করতে চেষ্টা করা হয়েছে। বিভূতিভূষণের সব গল্প (২১৯টি) নিয়ে আলোচনা করাও সম্ভব নয়। তাই আলোচ্য প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য যে বিশিষ্ট গল্পগুলোতে বিশেষভাবে বিধৃত, তারই গুটিকয়েক গল্প বেছে নিয়ে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। কোন একটি গল্পের সামগ্রিক আলোচনা না করে, ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য বা শিল্পরীতির আলোচনা প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের ঐ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ছোটগল্পের একটা বৈশিষ্ট্য আলোচনাকালে কয়েকটি গল্পের শুধু ঐ ঐ বৈশিষ্ট্য কতটা বর্তমান - তা-ই আলোচনা করা সঙ্গত। ছোটগল্পের শিল্পরীতির যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে সে গুলো হচ্ছে - ভাষাশৈলী, মহামুহূর্ত বা পরম মুহূর্ত সৃষ্টি, বিষয় ও ভাবের একমুখীনতা, চরিত্র নির্মাণ, প্লট বা আখ্যান পরিকল্পনা, নাটকীয়তা, ব্যঞ্জনধর্মিতা, ইঙ্গিতময়তা। প্রথমেই বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের ভাষাশৈলী নিয়ে আলোচনা করা যাক।

Dhaka University Institutional Repository

কোন সাহিত্যের শিল্পবিচারের প্রধান মাপকাঠি তার ভাষা। বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য সহজতা, সরলতা ও সাবলীলতা। পুরনো আঙ্গিক ও পুরনো ভাষা ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করে নতুনত্বের সন্ধানই আধুনিকতার প্রধান শর্ত। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নতুন ফর্ম বা স্টাইল আবিষ্কারেই সাহিত্যের অগ্রগতি।[৫] শুধু ছোটগল্পেই নয়, তাঁর সমগ্র সাহিত্যে বিভূতিভূষণের ভাষা প্রসাধনহীন। ভাষার এ প্রসাধনহীনতা বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে ব্যঞ্জনা সৃষ্টির অন্যতম উপায়। এটা তাঁর ভাষার দারিদ্র্যের লক্ষণ নয়; বরং শিল্পবোধের সমৃদ্ধির লক্ষণ।

তাঁর ভাষা ও স্টাইল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের ভাষা যেন স্নিগ্ধ ঝর্ণার মতো হৃদয় থেকে স্বতোৎসারিত। তাঁর ভাষা তাঁর ভাবের অনুগামী। এখানে বিভূতিভূষণ অনন্য। "এই আশ্চর্য স্বচ্ছ ভাষা যেন স্ফটিক স্বচ্ছ জলধারার মতো। এই ভাষার মধ্য দিয়ে লেখকের চিত্তকে অতি সহজেই যেন প্রত্যক্ষ করা যায়। লেখকচিত্তের সঙ্গে পাঠকমনের যোগ এর ফলেই একান্ত সহজ ও অবাধ হয়।"[৬] সুরময় গীতিধর্মী প্রসাধনবর্জিত সাবলীল ভাষা তাঁর ছোটগল্পগুলোকে অপূর্ব শিল্পসুষমা দান করেছে। ভাষার এ স্টাইল একান্তভাবে বিভূতিভূষণের নিজস্ব। তাঁর আগে বাংলা ছোটগল্পে এ জাতীয় ভাষার ব্যবহার কেউ করেছেন বলে মনে হয় না । সেদিক থেকে তিনিই প্রথম।

বিভূতিভূষণের অধিকাংশ গল্পেরই ভাষা তাঁর মূল বক্তব্য প্রকাশের যথার্থ অনুসারী। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মেঘমল্লার' এর নাম গল্প 'মেঘমল্লার' সার্থকতম গল্প। তখনও তাঁর ভাষা নিজস্ব স্টাইল খুঁজে না পেলেও স্বরূপের অনুসন্ধানী। আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে সুরদাস (তান্ত্রিক গুণাঢ্য) প্রদ্যুম্নকে নিয়ে নদীর ঘাটে গেল। 'ভদ্রাবতী নদীর ধারে শাল-পিয়াল-তমাল বনে সে বার ঘনঘোর বর্ষা নামলো'। বাক্যটি প্রয়োগের সাথে সাথে মনের মধ্যে বর্ষার এক প্রাকৃতিক আবহের সৃষ্টি হয়ে যায়। 'বড় মাঠের পারে শালবনের কাছে দিক চক্রবালের ধারে নৈশ প্রকৃতি পৃথিবীর বুকের অন্ধকার শষ্পশয্যায় তার অঞ্চল বিছিয়েছে। শুধু বিশ্রাম ছিল না ভদ্রাবতীর, সে কোন্ অনন্তের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবার আকুল আগ্রহে একটানা বয়ে চলেছে, মৃদু গুঞ্জনে আনন্দ সঙ্গীত গাইতে গাইতে, কূলে তাল দিতে দিতে।' কিংবা 'মাঠের জ্যোৎস্নাজাল কাটিয়ে অনেক রাতে কাউকে বিহারের দিকে আসতে দেখলে সে একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থাকতো,যেন কতদিন আগে তার যে প্রিয় আবার আসবে বলে চলে গিয়েছিল, তারই আসবার দিন গুণে গুণে এ শ্রান্ত শান্ত ধীর পথ চাওয়া..... প্রতি সকালে সে কার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইতো।' সুনন্দার প্রতীক্ষাকে এ বর্ণনা আরও বেদনাবিধুর করে তোলে। 'শ্রান্ত শান্ত ধীর পথ চাওয়া' যেন পূজার প্রার্থনা হয়ে আত্মশুদ্ধির ধূপগন্ধ ছড়ায়। 'মেঘমল্লার' গল্পের রচনারীতি ও ভাষা বৈশিষ্ট্য তার কাহিনী ও ভাবের অনুগামী। সহজবোধ্য, প্রাঞ্জল ভাষার এ রচনারীতি গল্পটির অন্যতম শিল্পগৌরব।

Dhaka University Institutional Repository

বিভূতিভূষণের অন্যতম একটা শ্রেষ্ঠ গল্প 'পুঁইমাচা' (মেঘমল্লার)। এ যেন 'পথের পাঁচালী'রই ক্ষুদ্র সংস্করণ। 'পথের পাঁচালী'র খসড়া। 'পথের পাঁচালী'র হরিহর, সর্বজয়া, দুর্গা যেন 'পুইমাচার' সহায়হরি, অন্নপূর্ণা ও ক্ষেন্তির পূর্ণাঙ্গ রূপ। যে কোন সার্থক ছোটগল্পের অন্যতম এক প্রধান বৈশিষ্ট্য 'ইঙ্গিতময়তা'। গল্পের শুরুতেই সহায়হরির উক্তিতে তার প্রকাশ ঘটেছে- 'একটা বড় বাটি কি ঘটি যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভালো রস আনি'। সারা গল্প জুড়ে রয়েছে ক্ষেন্তির ভোজনলোলুপতার পরিচয়। তার পুঁইশাকের রস আস্বাদনের গভীর গোপন বাসনা যেন তার বাবার প্রশ্রয়েরই বহি:প্রকাশ। সহায়হরিও যেন এক ভোজনলোলুপ চরিত্র। তা চমৎকার একটি বাক্যেই গল্পের শুরুতেই বিভূতিভূষণ বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। স্ত্রী অন্নপূর্ণার রাগ ও জেরার সামনে সহায়হরির পলায়ন-তৎপর মনোবৃত্তির যুক্তি খণ্ডনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা, ক্ষেন্তির অসহায়ত্ব ও ভোজনপ্রিয়তা, অন্নপূর্ণার যন্ত্রণাক্লিষ্ট হৃদয়ের নীরব অভিমান বর্ণনায় লেখক আঁটসাঁট গাঁথুনির আটপৌরে ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে গল্পটিকে শিল্পসুষমা দান করেছেন।

" 'পুঁইমাচা' গল্পের রচনারীতি ও ভাষাবৈশিষ্ট্য তার অঙ্গবাহিত প্রকৃতি লাবণ্যের অনুগামী, তার নায়িকা ক্ষেন্তির মতোই সহজ, সরল, কিন্তু প্রয়োজনে অসম্ভব বিষাদঘন হয়ে ওঠার পক্ষে বলবান।"[৭] গল্পের শেষে শীতের সন্ধ্যার বর্ণনা, জ্যোৎস্নার শান্ত নির্জনতা ভঙ্গ করে পুঁটির অসমাপ্ত অন্যমনস্ক স্বতস্ফূর্ত বেদনাবিধুর সংলাপ 'দিদি বড় ভালবাসত'... এবং তিনজনের দৃষ্টি উঠোনের এক কোণে আবদ্ধ হয়ে পড়লো, 'যেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায় পাতায় শিরায় শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে .... বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে ...সুপুষ্ট, নধর ,প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর' বর্ণনা গল্পটিকে এক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করেছে। ক্ষেন্তির মৃত্যু ও পুঁইলতার বেড়ে ওঠা - এই দুই বিপরীত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লেখক যেন আশাময় জীবনের কোন গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করতে চাইছেন। এমন সরস, অনবদ্য ভাষাচিত্র রচনা করা একমাত্র সার্থক ও কৃতী গল্পকারের পক্ষেই সম্ভব। 'পুঁইমাচা' গল্পের ভাষা নির্মাণে বিভূতিভূষণ তাই অনন্য।

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের একটা বড় বৈশিষ্ট্য বিষয়ের সঙ্গে ভাষার যোগ। তার প্রকাশরীতি এতটাই সহজ ও সাবলীল যেন মনে হয় সাহিত্যের প্রকৃতিরাজ্যে ফুটে রয়েছে অসংখ্য বুনোফুল সাদামাটা স্বাভাবিকতায়। 'মৌরীফুল' তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। এ গ্রন্থের নাম গল্প 'মৌরীফুল' এর শুরুতেই ভাষার চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করা যায়। গল্পের শুরুতেই গল্পের পরিণতির যেন ইঙ্গিত রয়েছে 'অন্ধকার তখনও ঠিক হয় নাই। মুখুজ্যে বাড়ির পিছনে বাঁশবাগানে জোনাকীর দল সাঁজ জ্বালিবার উপক্রম করিতেছিল। তালপুকুরের পারে গাছের মাথায় বাদুড়ের দল কালো হইয়া ঝুলিতেছে - মাঠের ধারে বাঁশবাগানের পিছনটা সূর্যাস্তের শেষ আলোয় উজ্জ্বল।' গল্পের শেষও দেখি এমনই সন্ধ্যায় সুশীলার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। বড় শিল্পী অল্প কথায় অধিক বলেন। সুশীলার মৃত্যু তাই অনাড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় মাত্র একটি বাক্যে বর্ণিত 'সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সে মারা গেল।'

Dhaka University Institutional Repository

এর চেয়ে সহজ সরল ভাষা আর কী হতে পারে? বাক্যটি প্রমাণ করে যে সুশীলা সংসারে কতটা উপেক্ষিত, অবজ্ঞার ছিল। সুশীলার মৃত্যু যেন 'পথের পাঁচালী'র দুর্গার মৃত্যুকে মনে পড়িয়ে দেয়। একটিমাত্র বাক্য 'দুর্গা আর চাহিল না।' বিভূতিভূষণের ভাষার এমনই এক আটপৌরে বৈশিষ্ট্য যে তা সংযত; আবেগ বা উচ্ছ্বাসময় নয়। বিশেষ করে মৃত্যু-দৃশ্য বর্ণনায় তিনি মিতভাষী। 'পুঁইমাচা' গল্পে ক্ষেন্তির মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কোথাও মৃত্যুর উল্লেখ নেই। একটিমাত্র ক্ষুদ্র বাক্যেও নেই। শুধু হরিহরের একটি অসমাপ্ত বাক্য 'তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে ...' মৃত্যুর দৃশ্যকে বেদনাঘন করে তোলে। ভাষা ব্যবহারে এখানেই বিভূতিভূষণের সার্থকতা।

'মৌরীফুল' গল্পটি বিবৃতিধর্মী সাধু গদ্যে রচিত। কিন্তু কোথাও অসামঞ্জস্য মনে হয় না। ভাষাকে আশ্রয় করেই কাহিনীলতা প্রধাবিত হয়। পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে সুশীলা নিগৃহীত হলে সুশীলার নিষ্পাপ আচরণ, দৃঢ়, জেদী, প্রতিবাদী চরিত্র পাঠককূলের সহৃদয়তা লাভ করে। তার কারণ গল্পের ভাষাশৈলী। সংসারের কারোরই যেমন সুশীলার প্রতি করুণা বা অনুকম্পার লেশমাত্র নেই; লেখকও যেন তার প্রতি তেমনই নির্লিপ্ত থেকেছেন সংযত ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে। একটিও বাড়তি বাক্য ব্যয় করেন নি। তাতে সুশীলা আরও বেশি করে যেন সবার সহানুভূতি পেয়েছে। মৃত্যুর আগে জ্বরের ঘোরে সুশীলার প্রলাপ গভীর তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। তার সমস্ত অতৃপ্ত বাসনা যেন লেখকের উদাসীন নিরাসক্ত বর্ণনায় প্রলাপ নয়, সত্য হয়ে পাঠককে আপ্লুত করে 'তাহার বিবাহের রাত্রে কেমন বাঁশী বাজিয়াছিল, কেমন সুন্দর বাঁশী, ও রকম বাঁশী নদীর ধারে কত পড়িয়া থাকে,....আচ্ছা পিওনে মৌরীফুলের একখানা চিঠি দিয়ে গেল না কেন? লাল চৌকো খাম, খুব বড়, সোনার জল দেওয়া, আতর না কি মাখানো.....'। বর্ণনার এ ভাষা অতুলনীয় ঐশ্বর্যের ভাবদ্যোতক। প্রাঞ্জল অথচ ইস্পাত কঠিন। এ গল্পের ভাষা তাই শিল্পসম্মত।

বেশ ঘন পিনদ্ধ বুনোট বিভূতিভূষণের ভাষার। যেন 'অপরিহার্য শব্দের অবশ্যম্ভাবী বাণীবিন্যাস'। বাক্যের গাঁথুনি গাঢ়। কখনও তাঁর ভাষা প্রতীকী ব্যঞ্জনাময়, কখনও তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্বময়, কখনও চিত্রকল্পময়। ভাষার এ বহুমাত্রিক ব্যবহার বিভূতিভূষণের ছোটগল্পকে যথার্থ শিল্পমাধুর্য দান করেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই।

'জলসত্র' গল্পে (মৌরী ফুল) এরকম ভাষা ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায় - "পশ্চিম দিকে অনেক দূরে একটা উলুখড়ের ক্ষেত গরম বাতাসে মাথা দোলাচ্ছিল। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই কেবল চকচকে খরবালির সমুদ্র। ব্রাহ্মণের ভয়ানক তৃষ্ণা পেল, গরম বাতাসে শরীরের সব জল যেন শুকিয়ে গেল, জিব জড়িয়ে আসতে লাগলো। তৃষ্ণা এত বেশী হলো যে সামনে ডোবার পাতা-পচা কালো জল পেলেও তা তিনি আগ্রহের সঙ্গে পান করেন।" বিভূতিভূষণের এ বর্ণনা যেন পাঠকেরও তৃষ্ণা পাইয়ে দেয়। পাঠকও যেন তৃষ্ণায় ছটফট করতে থাকে। "ব্রাহ্মণ কিন্তু ক্রমেই ঘেমে নেয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর কান দিয়ে, নাক দিয়ে নিশ্বাসে যেন আগুনের ঝলক বেরুতে লাগলো। জিব জোর করে চুষলেও তা থেকে আর রস পাওয়া যায় না, ধুলোর মতো শুকনো। চারিদিকে ধূ-ধূ মাঠ খররৌদ্রে যেন নাচছে .....চকচকে বালির রাশি রোদ ফিরিয়ে দিচ্ছে..... মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘূর্ণি হাওয়া গরম বালি-ধুলো-কুটো উড়িয়ে নাকে মুখে নিয়ে এসে ফেলছে। ....অসহ্য পিপাসায় তিনি

Dhaka University Institutional Repository

চোখে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখতে লাগলেন। মনে হতে লাগলো - একটু ঘন সবুজ মতো যদি কোন পাতাও পাই, তাহলে চুষি ....জীবনে তিনি যতো ঠাণ্ডা জল খেয়েছিলেন তা এইবার তাঁর একে একে মনে আসতে লাগলো।" অসাধারণ পঙ্‌ক্তি নির্মাণ করে তিনি তৃষ্ণাকে মূর্তিমান করে তুলেছেন। 'ধূ ধূ মাঠ খররৌদ্রে যেন নাচছে' পঙ্‌ক্তিটি চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছে।

'ভণ্ডুল মামার বাড়ি'(যাত্রাবদল) গল্পে ভাষা বিবৃতিমূলক হলেও ইঙ্গিতধর্মী। সাদামাটা চালিত গদ্যরীতি ব্যবহার করে তিনি গল্পরসকে ব্যঙ্গাত্মক করে তুলেছেন। দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ না করেও তিনি পাঠককে দার্শনিক সত্যের সোপানে উপস্থিত করেন। "আমার মনে হলো ভণ্ডুল মামার বাড়ি উঠছে আজ থেকে নয়, জীবনের পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধরে..... যেন অনন্তকাল, অনন্ত যুগ ধরে ভণ্ডুলমামার বাড়ির ইট একখানির পর আর একখানি উঠছে..... শিশু থেকে কবে বালক হয়েছিলুম, বালক থেকে কিশোর, কৈশোর কেটে গিয়ে এখন প্রথম যৌবনের উন্মেষ, আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেয়ে কত শত জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্ত্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভণ্ডুলমামার বাড়ি হয়েই চলেছে, ওরও বুঝি আদিও নেই, অন্তও নেই।" " 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পে শৈশবের নির্বোধ জিজ্ঞাসা, কৈশোরের কৌতূহল ও অকারণ অন্বেষণ, যৌবনের অভিজ্ঞতার ভার, মধ্যবয়সীর আবেগ ও বিবেকের সহাবস্থান - এ সবের প্রত্যেক স্তরের ভাষায় গল্পকার প্রতি প্রসঙ্গেই সেই সেই বিশেষ ব্যক্তিত্বের চিত্র যথার্থ করেছেন। বলার এই সেই বিশেষ ব্যক্তিত্বের চিত্র যথার্থ করেছেন।" বলার এই রীতি বিভূতিভূষণের ভাষার শিল্পকৌশল।

ভাষা হচ্ছে সাহিত্যকর্মে প্রধান উপাদান। ভাষা ব্যবহারে যিনি যত দক্ষ, তাঁর সাহিত্যও তত শিল্পধন্য। সেদিক দিয়ে বিভূতিভূষণ সার্থক। 'বাটি চচ্চড়ি' (কিন্নর দল) গল্পে রুগ্‌ণ বধূর বর্ণনায় দেখি তাঁর ননদের সাথে ঝগড়ার পরের কষ্টটাকে ।"রুগ্ন বধূটির শুষ্ক নয়নদ্বয় বিদীর্ণ করে ঝরে পড়ে আঝোরে মুক্তার মতো অশ্রুকণা নিদারুণ ঘৃণায় ও বেদনায়, ননদের এই বাক্যবাণের সুতীব্র আঘাতে। স্বামীর অর্থহীনতা এবং নিজের রোগের চিন্তায় তার সারা কোমল অন্তরাত্মা সহসা রী রী করে ওঠে। আর পিসিমার মুখে তখন যেন তুবড়ীতে আগুন লেগেছে। সমস্ত বারুদ না নিঃশেষিত হলে সে নীরব হবে না। বৌমা আস্তে আস্তে বাটিটা নিয়ে আসে সকলের অজ্ঞাতসারে।"

'কিন্নর দল ' (কিন্নর দল) গল্পেও এরকম সাদামাটা অথচ মর্মস্পর্শী ভাষা ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শ্রাবণ মাসের প্রথমে প্রসব করতে গিয়ে শ্রীপতির বউ মারা যায়। "অনাত্মীয়ের মৃত্যুতে খাঁটি অকৃত্রিম শোক এরকম এর আগে কখনও এ গাঁয়ে করতে দেখা যায় নি। রায়-গিন্নী, চক্কত্তি-গিন্নী, শান্তির মা, মণ্টুর মা কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। ঐ মেয়েটি কোথা থেকে দু'দিনের জন্যে এসে তার গানের সুরের প্রভাবে সকলের অকরুণ, কুটিলভাবে পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছিল, সে পরিবর্ত্তন যে কতখানি, ওই সময়ে গাঁয়ের মেয়েদের দেখলে বোঝা যেত।" সময় কিংবা প্রকৃতির বর্ণনা বিভূতিভূষণের চরিত্রের উপর প্রভাব ফেলে। কাহিনীকে আরও নিরেট করে তোলে। 'ননীবালা' (রূপহলুদ) গল্পে ভাষার এরকম স্নিগ্ধ বুনোট দেখা যায় - "সরবালার মন খুশিতে ভরে উঠলো। মাদলার মস্ত বড় বিল পদ্ম আর লালফুলের বনে ভরে আছে। নীল আকাশ উপুড় হয়ে আছে বিলের ওপর। যদিও বর্ষাকাল, আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার। শরতের আমেজ আছে রন্দুরের গায়।"

Dhaka University Institutional Repository

সন্ধ্যা, দুপুর, রাত কিংবা সকালের উল্লেখ না করেও তিনি ভাষার অপূর্ব ব্যবহারে সময়কে ঠিকই মূর্ত করেছেন তাঁর গল্পে-সাহিত্যে। 'ননীবালা' গল্পেই দেখি "বকের দল ছায়াভরা নীল আকাশের গা বেয়ে পাল্লার বড় বিলের দিকে চলেছে। বিলের উত্তর পাড়ে বন-জাম গাছের ডালে ডালে কালো বাদুর ঝুলছে। ঘুংরি পোকা, ঘুর্-র্-র্ শব্দ করে ডাক শুরু করে দিয়েছে ঘাসের বনে।"

একটি অসাধারণ গল্প 'জন্ম ও মৃত্যু'(জন্ম ও মৃত্যু)। ভাষার এমন তীর্যক ব্যবহার কাহিনীকে মর্মস্পর্শী করেছে। মৃত শশী ঠাক্‌রুণের শ্রাদ্ধে শোকের পরিবর্তে যেন আনন্দের হাট বসেছে। "বৃদ্ধা, মাজা-বাঁকা, গাল-তোবড়ানো শশী-ঠাক্‌রুণ কাঁসার বাটি বিক্রয় করতে গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরছে নাপিত-বাড়ী থেকে। এই হাসিমুখ বালক-বালিকা, কিশোর- কিশোরী, তরুণী - এদের সৌন্দর্য্য, সজীবতা, আনন্দ, যৌবন - এদের সৃষ্টি করেছে সেই দরিদ্রা বৃদ্ধা শশী ঠাক্‌রুণ - এরা তারই বংশধর - তারই পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, আজ তার মৃত্যু-বাসরে এই যে চাঁদের হাট বসেছে - এতদিন এরা ছিল কোথায়?" ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি আঞ্চলিক শব্দকে পরিহার করতেন না। তাতে কাহিনী আরও বাস্তবতা পেত। যেমন:'বৃদ্ধা মাজা-বাঁকা, গাল-তোবড়ানো'তে 'কোমর' না বলে 'মাজা' বলেছেন, 'কোচকানো' না বলে 'তোবড়ানো' বলেছেন। এছাড়াও বিভূতিভূষণের ভাষার আর একটা বৈশিষ্ট্য পাত্র-পাত্রী অনুসারে সংলাপ ব্যবহার। যে অঞ্চলের কাহিনী বা পাত্র-পাত্রীর বাড়ি যে অঞ্চলে, তাদের সংলাপও সে অঞ্চলেরই। চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ ব্যবহার করেছেন তিনি। 'সই'(জন্ম ও মৃত্যু) গল্পে এরকম সংলাপ রচনা করেছেন। 'এই তোমার সয়া হাট কত্তি এল। নতুন গুড়ের পাটালি সের দুই করেলো আজ বেন্‌বেলা। ছোট ছেলেডার আবার জ্বর আর ছর্দ্দি।' সই তার ক্ষুধার্ত ছেলেকে প্রবোধ দেয় , 'তোর সই মা কি তোরে এমনি জল দেবে? কিছু খাতি দেবে অখন দেখিস্। দেখি? পেটটা পড়ে রয়েছে, অ মোর বাপ, সেই সকালে দুটা পান্তা খেয়োলো, আহা।' চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ ব্যবহার কাহিনীকে আরও প্রাণবন্ত করে। সে বিষয়ে বিভূতিভূষণ সচেতন এবং সিদ্ধহস্ত।

ভাষা ভাবের বাহন। সহজ, সরল ভাষা কখনও কখনও পাঠককে নিয়ে যায় গভীর কোন তত্ত্বের জ্যোতির্লোকে। 'ডাকগাড়ী' (জন্ম ও মৃত্যু) গল্পে ভাষার তেমনি প্রয়োগ দেখা যায়। "রেলগাড়ী চাপিয়া রাধার মনে হইল সে মুক্তির স্বাদ পাইয়াছে বহু দিন পরে। কেবল বাবা- মায়ের একঘেয়ে ঝগড়া, অশান্তি, কেবল 'নাই নাই' শুনিতে শুনিতে তাহার তরুণ মন অকালে প্রৌঢ়ত্বের দিকে চলিয়াছে। সংসারে আলো নাই, বাতাস নাই, এতটুকু আনন্দ নাই - শুধুই শোনো চাল নাই, কাঠ নাই,একাদশীর আটা কোথা হতে আসিবে, নুবুর কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, নতুন একটা ইজের ছ'আনা হইলে পাওয়া যায়, তা যেন ছ'টি মোহর।" ভাষা যেন ভাবকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। রাধা যখন দার্জিলিং মেল দেখলো, তখন তার ভিতর একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। 'সে যেন নতুন মানুষ হইয়া গিয়াছে'। দার্জিলিং মেলের সুন্দর চেহারার মেয়ে-পুরুষ দেখে রাধার মনে হলো - 'যে পৃথিবীতে এরা আছে, সেখানে তার বাবার বাতের বেদনা, সুবির হৃদয়হীনতা,মায়ের খিটখিটে মেজাজ, বাবা-মায়ের ঝগড়া, শাশুড়ীর নিষ্ঠুর ব্যবহার সব ভুলিয়া যাইতে হয়, এমনকি তার ছ'ভরির হার ছড়ার লোকসানের ব্যথাও যেন মন হইতে মুছিয়া যায়।'

Dhaka University Institutional Repository

চমৎকার ভাষা প্রয়োগে গল্পরস ঘনীভূত হয়েছে এ গল্পে। বর্ণনার চমৎকারিত্বে গল্পকার পাঠককে নিয়ে যান দার্শনিক সত্যের উপান্তে । ভাষার যাদুস্পর্শে সামান্য কিছুও কত অসামান্য হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ 'ডাকগাড়ী' গল্পটি। এরকম আরও অসংখ্য গল্পে বিভূতিভূষণ সে স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

সাদামাটা প্রাঞ্জল ভাষা যে কত মর্মস্পর্শী হতে পারে 'ফিরিওয়ালা' (বেণীগীর ফুলবাড়ী) গল্পটি তার অন্যতম এক উদাহরণ। ফিরিওয়ালার তরুণ ছেলেটি হারিয়ে যায় ছেলেমানুষ বউটাকে রেখে তার বাপের কাছে। আর ফিরে নি। বারো বছর পর তার শ্রাদ্ধের দিন কথককে লোকটি বলে - 'ওর তিন কূলে কেউ নেই। তাইতো মাঝে মাঝে ভাবি, বয়েস হয়েছে, আজ যদি চোখ বুজি, আমি তো বেশ যাব, পুত্তুরশোক জুড়িয়ে যাবে। কিন্তু বৌমার কথা যখন ভাবি, তখন আর কিছু ভালো লাগে না। কার কাছে রেখে যাব ওকে, সোমত্ত বয়েস, এক পয়সা দিয়ে যেতে পারবো না। কখনো ঘরের চৌকাঠের বাইরে পা দেয় নি কি খাবে, কোথায় যাবে।'সহজ ভাষায় বেদনাঘন পরবেশ সৃষ্টি করে গল্পটিকে শিল্পমাধুর্য দান করেছেন।

'দ্রবময়ীর কাশীবাস' (নবাগত) গল্পে এরকম স্নিগ্ধ ভাষার প্রয়োগ দেখি। মাটির টানে কাশী থেকে ফেরৎ এসেছেন দ্রব ঠাকরুণ। বলেছেন - "আমার এই ভিটেতেই যেন তোদের কোলে শুয়ে সকলের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে যেতে পারি। কাশী পেরাপ্তিতে দরকার নেই- এই ভিটেই আমার গয়া কাশী। তিনি এই উঠোনের মৃত্তিকেতে শুয়েছিলেন ওই তুলসীতলায়- আমাকেও তোরা ওখানে.....'। বড় শিল্পীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো অল্প কথায়, সহজ ভাষায় গভীর কিছু প্রকাশ করা। বিভূতিভূষণ সে ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ। সব ক'টি গল্প বিশ্লেষণ করলেও একই তথ্য পাওয়া যাবে প্রায়। গল্পশৈলীর অন্যক্ষেত্রে কৃতিত্ব যা-ই থাকুক ভাষা ব্যবহারে তিনি সিদ্ধহস্ত। তবে অমোঘ প্রকৃতিপ্রীতি, অতিমাত্রায় নস্টালজিয়া এবং মাত্রাতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা কখনও কখনও গল্পের রসহানি ঘটিয়েছে। কিন্তু পাঠককে ক্লিষ্ট করে নি; বরং আবেগমোহিত করেছে।

সাহিত্যের প্রথম শর্ত ভাষা। ভাষা প্রয়োগ যথার্থ হলে শিল্পরস ঘনীভূত হয়। বিভূতিভূষণের গল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো ভাষার চমৎকারিত্ব। সহজ, সরল বুনোট; অথচ প্রাণবন্ত, স্বতোৎসারিত। গাঁথুনি মজবুত। শব্দের যথার্থ প্রয়োগ, পরিমিতিবোধ, ভাষার প্রাঞ্জল ব্যবহার গল্পের শিল্পরূপকে সাফল্য দান করেছে।

আধুনিক ছোটগল্পের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুহূর্ত সৃষ্টি। একটি মাত্র মহামুহূর্ত বা চরমক্ষণ থাকতে হবে, যার উপর নিবদ্ধ হবে গল্পের সমগ্র উৎকণ্ঠা। কেউ কেউ এই পরম মুহূর্তকে Climax বলেছেন। ছোট বা সংক্ষিপ্ত কোন ঘটনার শেষে অপেক্ষা করে থাকবে একটি চরম মুহূর্ত। লেখক তার চিরন্তন জীবন-দৃষ্টিকে সেই চরম মুহূর্তের দর্পণে প্রতিফলিত করে তোলেন। মুহূর্তের সেই পরম উদ্ভাসনই ছোটগল্পের একমাত্র অন্বিষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

ছোটগল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ এই 'মুহূর্ত' সৃষ্টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'রবি-প্রশস্তি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন-'মূল কৌশলটি হইল ছোটগল্পের মুহূর্ত্ত বা moment। এই মুহূর্ত সৃষ্টিই ছোটগল্পের আর্টের প্রাণবস্তু।'[৯] কিন্তু বিভূতিভূষণই এ রীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন নি। বেশির ভাগ গল্পেই তিনি মুহূর্ত সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তার কারণ তিনি কাহিনীকে শুধু বর্ণনা করে গেছেন। ঘটনার উত্থান-পতন কিংবা চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংশয় সৃষ্টি তনি করেন নি।

'বিভূতিভূষণের গল্পের উদ্ভাস মুহূর্তগুলি কিন্তু ঘটনা সংঘাতের ফলে সৃষ্ট হয় না, সৃষ্ট হয় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য থেকে, অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি থেকে। এই অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্ত হয়ে থাকে একটা সূক্ষ্ম, অতি অন্তরঙ্গ অথচ স্বতস্ফূর্ত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি।'[১০] বিভূতিভূষণের গল্প বলার সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভঙ্গি অনেক সময় গল্পশৈলীর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গল্পের সৌন্দর্য বা শিল্পসাফল্য ব্যহত হয়েছে। 'এ আশঙ্কার একটি কারণ যেমন অতি সহজ ভঙ্গি, আর এক কারণ - চরম মুহূর্তের অভাব -যা আবার তাঁর সার্থক গল্পগুলিরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ছোটগল্পে সাধারণতঃ তথ্য বিন্যাসের ধাপ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে একটি পরম মুহূর্তের মুক্তাঙ্গন মেলে। বিভূতিভূষণের গল্পে কিন্তু ন্যূনতম তথ্যের মধ্যে বিশেষ করে কোন পরম তথ্য নেই। তাঁর গল্পের পরম, বিশেষ করে কোন চরম মুহূর্ত নেই, তা সারা গল্পেই ছড়িয়ে আছে। একটি অবস্থাতেই সে দীপ্ত নয়, সব অবস্থাতেই দ্রুত।'[১১] তবুও বেশ কিছু গল্পে মুহূর্ত সৃষ্টির চেষ্টা লক্ষণীয়।

এ রকম ঘটনা-বিরল মুহূর্তনির্ভর সার্থক গল্প হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে - তুচ্ছ (অসাধারণ), গল্প নয় (জ্যোতিরিঙ্গণ), ভিড় (নবাগত), আহ্বান (উপলখণ্ড), কিন্নর দল (কিন্নর দল), পুঁইমাচা (মেঘমল্লার), ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল (নবাগত), অসাধারণ (অসাধারণ), খেলা (কুশল পহাড়ী) ইত্যাদি গল্পকে।

'তুচ্ছ' গল্পে গরিব ছোট মেয়েটির মাথায় লেখক সামান্য একটু গন্ধ তেল মেখে দিয়েছেন। এতে মেয়েটির এবং লেখকের সে কী যে আনন্দ! ওই আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তটিকে লেখক গল্পের শেষে ধরে রেখেছেন স্মৃতির গভীরে 'কি আনন্দ আমার স্নান করতে নেমে নদী জলে। উদার নীল আকাশে কিসের যেন সুস্পষ্ট সৌন্দর্যময় বাণী। অন্তরের ও বাইরের রেখায় রেখায় মিল।

'গল্প নয়' গল্পটিতে দেখি এমনি মুহূর্ত সৃষ্টির প্রচেষ্টা। ট্রেনের কামরায় মাথায় ঘা- রুগ্ণ কঙ্কালসার চেহারার শিশুটিকে দেখে সবাই ঘৃণায় যখন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে দুই তরুণী বধূ তখন তার কুশাল নিয়ে ব্যস্ত। তরুণী বধূটির উদ্বেগ, "ঠাণ্ডা মোটে লাগিও না, বিষ্টি হচ্ছে জানালাটা বন্ধ করে দাও। আহা, এমনিতেই তো ওর কাসি হয়েছে।" লেখককের মুহূর্তের সংবিৎ হলো এবং সেই মুহূর্তটিকে ধরে রাখলেন গল্পের শেষে 'সনাতনী মাতৃরূপা নারী দু'টি এসে এই মাতৃহীন মৃত্যুপথযাত্রী শিশুকে মাতৃস্নেহের বহু পুরাতন অথচ চির নূতন বাণী শুনিয়ে দিলেঃ সেদিন সে ট্রেনের মধ্যে গুটি কয়েক ক্ষণের জন্য বিংশ শতাব্দী ছিল না - সমাজদ্রোহী, কালোবাজারপুষ্ট, লোভী বিংশ শতাব্দীর। ছিল সেই অমর মাতৃলোক, বিশ্বের সমগ্র জীবজগৎ যার করুণাধারায় বিধৌত।'

Dhaka University Institutional Repository

'মুহূর্ত সৃষ্টি' সার্থক ছোটগল্পের এক অনিবার্য শিল্পপদ্ধতি। গতানুগতিক ছোটখাটো ঘটনা হঠাৎ যখন কোন বিশেষ ক্ষণে কিংবা বিশেষ পরিস্থিতিতে কাহিনীতে প্রভাব ফেলে বা চৈতন্যে আলোড়ন তোলে, তখনই মুহূর্ত সৃষ্টি হয়।

'ভিড়' (নবাগত) গল্পেও এরকম মুহূর্ত সৃষ্টির প্রয়াস দেখি। এখানেও ট্রেনের কামরায় ভিড়ের কারণে ঝগড়া, মারামারি লেগে রয়েছে। মুখখানাতে বদমাইশি মাখানো কলহ-কোলাহল নির্মমতার প্রতীক বলে যার প্রতি ঘৃণা জন্মেছিল সে যখন তার বাইশ বছরের ছেলের সদ্য মৃত্যুশোকে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো, তার প্রতি তখন সবার সহানুভূতি হলো। "কেঁদো না ভাই, কি করবে কেঁদে, আহা, বাইশ বছরের ছেলে। বাঁচা মরা কারো হাতে নয় দাদা। নাও বিড়িটা ধরাও।" "ওই একটি পুত্র বিয়োগাতুর পিতার ক্রন্দনে গাড়ীর আবহাওয়া যেন বদলেগেল এক মুহূর্তে। সূচ্যগ্র পরিমাণ স্থানের জন্যে যে নির্লজ্জ চেষ্টা ও আঁকড়ে থাকবার আগ্রহ তা বন্ধ হয়ে গেল।" "যে লুঙ্গিপরা লোকটিকে এতক্ষণ আমি গুণ্ডার সর্দ্দার বলে ভাবছিলাম, তার মুখের দিয়ে চেয়ে কেমন একটা করুণা ও সহানুভূতির উদ্রেক হলো। হতভাগ্য পিতা, হয়তো ওর বৃদ্ধ বয়সের সম্বল হয়ে দাঁড়াত এই পুত্রটি, হয়তো ওর একমাত্র পুত্র। গাড়ীর আবহাওয়া ওর কান্নার সুরে কি আশ্চর্য্য ভাবেই বদলে গিয়েছে।"

'পুঁইমাচা' (মেঘমল্লার) গল্পের শেষেও দেখি এরকম মুহূর্ত সৃষ্টির সার্থকতা। এটি কোন ঘটনাপ্রধান বা চরিত্রপ্রধান গল্প নয়। লেখকের নিজস্ব এক জীবন-দৃষ্টি গল্পের পরিণতির দিকে এগোতে এগোতে Climax এর সৃষ্টি করেছেন। প্রতীক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গল্পটিতে লেখক প্রকৃতি-দর্শনের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। গল্পটির শেষ তার প্রকৃতির সঙ্গে Parallel। নায়িকার স্বভাবের বিপরীত গল্পের পরিণতি, পরম মুহূর্ত সৃষ্টি করেছে। পাঠকচিত্তে এক গভীর আলোড়ন তুলেছে এই পরম মুহূর্তটি - "যেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায় পাতায় শিরায় শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে .....বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি কচি সুবজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে .....সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।"

অসাধারণ (অসাধারণ) গল্পের শেষেও দেখি মুহূর্ত সৃষ্টির চকিত আলোয় উদ্ভাসিত, বেদনা-ক্লিষ্ট হয় পাঠকচিত্ত। দুর্ভিক্ষের শিকার এক দম্পতির করুণ বেঁচে থাকার কাহিনীর একটা পর্যায়ে এসে Climax তৈরী করেছে। অনাহারক্লিষ্ট রুগ্‌ণ স্বামীকে লঙ্গরখানা থেকে আনা রিলিফের খিচুড়ির কিছুটা খাইয়ে বাকিটা স্বামীর রাতে খাওয়ার জন্য মালসাতেই রেখে দিয়েছে মেয়েটি অভুক্ত থেকে। স্বামীকে জল খাওয়ানোর জন্য কোন পাত্র পর্যন্ত তার নেই। 'খাওয়ানো শেষ হইলে সে কলেরা ওয়ার্ডের কম্পাউন্ডের টিউবওয়েল হইতে শতচ্ছিন্ন শাড়ীর আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া স্বামীর মুখে নিংড়াইয়া দিল। লোকটা হাঁ করিয়া দু'ঢোক জল গিলিয়া বলিল - আর একটু খাবো - মেয়েটি আবার গেল টিউবওয়েলের কাছে, আবার শাড়ীর আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া ওর মুখে দিল। আমি কখনো এমন দৃশ্য দেখি নাই।"

Dhaka University Institutional Repository

কিছু গল্পে এমন চমৎকার মুহূর্ত সৃষ্টি গল্পের শিল্পরূপকে যথার্থ সাফল্য দান করেছে। কিন্তু তা খুব বেশি নয়। বিভূতিভূষণের অধিকাংশ ছোটগল্পে সার্থক মুহূর্ত সৃষ্টির অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর আবেগঘন অকৃত্রিম প্রাণবন্ত বর্ণনায় গল্পের মাধুর্য অক্ষুণ্ন রয়েছে। এরকম চরম বা পরম মুহূর্ত সৃষ্টি অধিকাংশ গল্পে না হলেও সারা গল্পশরীর জুড়ে তার একটা আমেজ তৈরী হয়ে থেকেছে - এখানেই বিভূতিভূষণের সার্থকতা - তাঁর গল্প শিল্পধন্য।

বিষয় ও ভাবের একমুখীনতা ছোটগল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য। প্রকরণের দিক থেকে ভিভূতিভূষণের অধিকাংশ গল্পেই ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় সংহতি বিষয় ও ভাবের একমুখীনতার লক্ষণ যথেষ্ট পরিস্ফুট। অভিশপ্ত (মেঘমল্লার), পুঁইমাচা (মেঘমল্লার), জলসত্র (মৌরীফুল), খুঁটি দেবতা (মৌরীফুল), বুধীর বাড়ি ফেরা (কিন্নর দল), ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল (নবাগত), বারিক অপেরা পার্টি (মুখোশ ও মুখশ্রী), ভণ্ডুল মামার বড়ি (যাত্রাবদল) ইত্যাদি গল্পে বিষয় ও ভাবের একমুখীনতা লক্ষ্য করা যায়। বেশ কিছু গল্পে কাহিনী বিন্যাসে কেন্দ্রীয় সংহতি থাকলেও তার গতি সর্বত্র সুনির্দিষ্টভাবে একমুখী নয়। নস্টালজিয়া স্মৃতিচারণায় বা অতীতমুখীনতায় অনেক স্থলেই গল্পের গতি মন্থর বা বিলম্বিত। এ পর্যায়ে তিনি ছোটগল্পের প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি থেকে কিছুটা বেরিয়ে এসে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন।

ছোটগল্পের প্রচলিত প্রকরণ-পদ্ধতি প্রায় সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে একেবারে নতুন পদ্ধতিতে নিজস্ব ধারায় পথ চলেছেন পথিক কবি বিভূতিভূষণ। তাঁর গল্পের শিল্পরীতি কাহিনী বা ঘটনার মধ্যে আবদ্ধ রাখে না পাঠককে, তা মহূর্তে পৌঁছে দেয় জীবনের গূঢ়অর্ন্তলোকে। এটা তাঁর নিজস্ব টেকনিক।

ছোটগল্পের শিল্পসাফল্যের একটা মূল বিষয় চরিত্র সৃষ্টি। শিল্পভাবনায় অভিজ্ঞতা প্রয়োগের মূল আধার হচ্ছে চরিত্র। কাহিনী বৃত্ত বা প্লট চরিত্রকে দেয় স্রোতের বেগ। চরিত্রের সঙ্কট, উত্থান-পতন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সংশয় সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে গল্প এগিয়ে চলে, কাহিনী গতিপ্রাপ্ত হয়। তাই চরিত্র যত বেশি বাস্তবানুগ ও প্রাণবন্তভাবে সৃষ্টি হবে, গল্পরসও তত ঘনীভূত হবে। চরিত্রের বিকাশ না হলে গল্প পাঠক-চিত্তের সহানুভূতি পায় না।

বিভূতিভূষণের 'সৃষ্ট চরিত্র প্রকৃতির স্বভাবে. মানব প্রাণের ধর্মে এক অলৌকিক রসাস্বাদ দেয়। চরিত্রের বাস্তবতা প্রকৃতি মানবের যুগ্মবেণীর স্বভাবে পূর্ণ জীবনের বিস্ময় ও রহস্যকে বিদ্যুচ্চমকে ধরিয়ে দেয়। এখানেই বিভূতিভূষণের চরিত্র সৃষ্টির অন্যতম দিক এবং কল্লোলের উতরোল পরিবেশে চরিত্রের নিঃসঙ্গ স্বভাব থেকে সঙ্গমাধুর্যের মধ্যে অবগাহন ঘটে।'[১২]

Dhaka University Institutional Repository

বিভূতিভূষণের গল্পের চরিত্ররা বেশ বিকশিত। বিভূতিভূষণ যেমন মানবধর্মের রূপটিকে ফোটাতে সচেষ্ট, তার চরিত্ররাও তেমনি স্বভাবধর্মে প্রাণবন্ত হয়ে বেড়ে উঠেছে। 'চরিত্রের মধ্যেকার মানবিক বোধের রসের বৈচিত্র্যের অভিনব আস্বাদ দানই তাঁর লক্ষ্য। যুগের সমস্যা, সঙ্কট এসব এড়িয়ে তাঁর চরিত্ররা একান্ত নিজস্ব মানব ভাবনার বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।' ভাষা ব্যবহারে যেমন বিভূতিভূষণ সিদ্ধহস্ত, চরিত্র নির্মাণেও তিনি তেমনি সফল। ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল (নবাগত), দ্রবময়ীর কাশীবাস (নবাগত), ভণ্ডুল মামার বাড়ি (যাত্রাবদল), পুঁইমাচা(মেঘমল্লার) ডাইনী (কিন্নর দল), বিধুমাস্টার (কিন্নর দল), যদুহাজরা ও শিখি ধ্বজ (জন্ম ও মৃত্যু), ফিরিওয়াল (বেনীগীর ফুলবাড়ী), মুক্তি (নবাগত), কাঠ বিক্রি বুড়ো (অসাধারণ), রূপো বাঙাল (অসাধারণ), নসুমামা ও আমি (উপলখণ্ড), বারিক অপেরা পার্টি (মুখোশ ও মুখশ্রী), থনটন কাকা (জ্যোতিরিঙ্গণ), সিঁদুরচরণ (ক্ষণভঙ্গুর), প্রভৃতি গল্পে দেখি চরিত্রের উজ্জ্বল বিকাশ। গল্পগুলোর কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলো আপন প্রাণধর্মের মানবিক গুণে প্রস্ফুটিত।

যে কোন চরিত্রভিত্তিক গল্পের ভেতরে থাকে মনস্তত্ত্ব। সমকালীন সমাজ-সমস্যা ও পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তি সম্পর্কের জট তৈরী ও উন্মোচন থাকবে গল্পের ভেতরে। চরিত্রনির্ভর গল্পে কোন একটি বিশষ চরিত্রের ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য লক্ষণ প্রকাশিত হবে। চরিত্রের জীবন ও মনের বিকাশ ঘটবে গল্পে। সবশেষে পাঠকচিত্তে অবলীলায় ছড়িয়ে দেবে সহানুভূতির চমক দীপ্তি।

'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' নগরিক জীবনের পটে ধৃত একটি চরিত্রাত্মক গল্প। এ গল্পে চরিত্র বিকাশের এসব চমৎকার শিল্পসম্মত বুনন রয়েছে। বিভূতিভূষণ গভীর মমতায় বিশেষ এক ব্যক্তিত্ব দিয়ে গড়েছন কৃষ্ণলাল চরিত্র। কৃষ্ণলালের চরিত্রের গভীরে অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে তিন ডাইমেনশন ধরা পড়ে। ক. নাগরিক জীবনে অস্তিত্ব রক্ষার রূঢ় বাস্তবতা। খ. তার পেশাকে জীবন-যাপনের সঙ্গে গভীরভাবে সমন্বয় ঘটানো। গ. পেশায় ও নেশায় জীবন-ধারণ ও জীবন-যাপনকে সমন্বয় ঘটানো। পার্শ্ব চরিত্র হিসেবে গোলাপী চরিত্র সৃষ্টিও যথেষ্ট সংযত ও মানানসই। কৃষ্ণলালের চরিত্রের সাথে তার ছায়ার মতো যোগ। গোলাপী সমাজে একজন অস্পৃশ্য পতিতা রমণী, বারো-বিলাসিনী, কৃষ্ণ লালের রক্ষিতা ও প্রেমিকা - এ যেমন সহজবোধ্য, তেমনি তার নৈতিকতা নিয়ে পাঠকের মনে কোন বিরূপ মনোভাব তৈরী হয় না।

সমাজের দৃষ্টিতে সে যে স্তরের হোক পাঠকের সমবেদনা সে অবলীলায় আদায় করে নেয়। চাকুরি চলে গেলে গোলাপী যখন তার বার্ধক্যের প্রসঙ্গ তুলে চাকুরি না পাওয়ার সন্দেহ প্রকাশ করে, তখন আবেগে, উত্তেজনায় কৃষ্ণলাল হেরে না যাওয়ার প্রত্যয়ে-শপথে গোলাপীর সামনেই সেই সুন্দর ঢঙ্গে তার ক্যানভাসিংয়ের বক্তৃতা শুরু করে দেয়। সে প্রমাণ করতে চায় ক্যানভাসারদের মধ্যে পেশায় শিল্পী কৃষ্ণলাল একজন কর্মিষ্ঠ মানুষ, আলস্য তার কাছে ঘৃণ্য। হতাশা পরাজয়ের গ্লানি আর এই শিল্পপ্রীতি থেকেই অভ্যাস সফল রাখার জন্য সে আবার নিঃস্বার্থ ভাবেই সেই বাতের তেল এর ক্যানভাস করতে আসে ডালহৌসি পাড়ায়। ভাগ্যক্রমে চাকুরিটি সে ফিরে পায়। এখানেই কৃষ্ণলাল চরিত্রের উৎকর্ষ লাভ। এভাবেই বিভূতিভূষণ তাঁর গল্পের নানা চরিত্রের উত্তরণ ঘটিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

জীবন সম্পর্কে বিভূতিভূষণ সবসময়ই পরম আস্থাশীল। তাই তাঁর কাছে জীবন তুচ্ছতা, অকিঞ্চিৎকরতা সত্ত্বেও অর্থহীন নয়। নিতান্ত একঘেয়ে, বঞ্চিত, বিড়ম্বিত, বিবর্ণ জীবনকে তিনি এঁকেছেন গভীর মমতায়। হতভাগ্য মানুষের জন্য তাঁর ছিল গভীর মমত্ববোধ। সে কারণেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো মূলতঃ ভালোমানুষ। শত প্রলোভনেও তারা সৎ ও আদর্শময়। এরা যেন লেখকের আপন সত্তারই প্রক্ষেপ বিশেষ। চরিত্রে কোন দ্বন্দ্ব নেই, জটিলতা নেই।

সে জন্যই গল্পের মানুষেরা সজীব। কিন্তু মানব চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় দ্বন্দ্ব-জটিল রূপটিকে তারা প্রকাশ করতে পারে না। বহুমখী চেতনার আলো-ছায়ায় এরা রহস্যময় নয়, বিচিত্র নয়। বৈচিত্র্যের পরিবর্তে সহজ-সরল মানবিক বৃত্তির বাস্তব ও মর্মস্পর্শী রূপায়ণ দেখা যায় এসব চরিত্রে। এরকমই একটি চরিত্র 'সিঁদুরচরণ' (ক্ষণ ভঙ্গুর) গল্পের সিদুঁরচরণ। দূরের তৃষ্ণায় সে ঘর ছাড়া। ভবঘুরে সিঁদুরচরণ বুনো মালী কাতুর সাথে বিয়ে না করে স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করে। হঠাৎ সিঁদুরচরণের ভ্রমণ পিপাসা পায় এবং ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে। গল্পের শেষে আবার সে কাতুর কাছে ফিরে আসে ভালোবাসার জীবন আশ্রয়ে স্থিত হওয়ার প্রত্যাশায়। সিঁদুর চরণ চরিত্রিটি যেন বিভূতিভূষণেরই ভবঘুরে মানস ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।

'পুঁইমাচা' গল্পটি চরিত্র প্রধান না হলে চরিত্রের বিকাশ গল্পের মূল লক্ষ্যকে ব্যঞ্জনাগর্ভ ও দীপিত করে তাদের শিল্পসীমা চিহ্নিত করেছে। একাধিক চরিত্রের মধ্যে ক্ষেন্তি কেন্দ্রীয় চরিত্র। গল্পের অন্তিম প্রতীক ক্ষেন্তিত সাধারণ চরিত্ররূপকে অসাধারণ, অলৌকিক এক চরিত্রস্বরূপে নির্বিশেষ করে তুলে। ক্ষেন্তির মৃত্যু এবং পুঁইলতার বেড়ে ওঠা পাঠকচিত্তে বেদনাবোধের মৃদু আলোড়ন তোলে। গল্পের চরিত্রগুলো সমকালীন সমাজ বাস্তবতার নিরিখেই অঙ্কিত। প্রকৃতির সাথে নায়িকার স্বভাবের বৈপরীত্যেই চরিত্রটি যথার্থতা পেয়েছে।

চরিত্রের বিকাশ দেখি 'রূপো বাঙাল' (অসাধারণ) গল্পের রূপো বাঙালের মধ্যে। রূপো ছিল চৌকিদার। সীতেনাথের ধানের গোলা, সম্পত্তি দেখা শোনা করতো - মাত্র সাড়ে তিন টাকার কর্মচারী রূপো। সারা গ্রাম ঘুরে এসে অনেক রাতে চৌকিদারি পোশাক পরে লাঠি হাতে রূপো অন্ধকারে সীতেনাথের চণ্ডীমন্ডপের পৈঠার ওপর বসে থাকতো। রূপোর সাহস ও সততা পাঠককে মুগ্ধ করে। মৃত্যুর আগে সীতেনাথ তাকে দেখতে এলে রূপো তার যাবতীয় হিসেব বুঝিয়ে দেয় - 'খাতার মুড়োয় লিখে রাখো, মুই চিঁড়ে খাবার বেনামুরি ধান নিইচি চার কাঠা, আহাদ মণ্ডল কলাই দু'কাঠা, বাড়ী দু'কাঠা, বিষ্টু ধেরিসি ছ'কাঠা ধান, বাড়ী চার কাঠা --মোর ধান পোষ মাসের ইদিকে দিতি পারবো না বলে দিচ্চি-ভুলে যাবো-লিখে রাখো।' ত্রিশ বছর পরে কথকের স্মৃতিচারণ - 'এই সব চোরাবাজারের দিনে, জুয়োচুরির দিনে, মিথ্যে কথার দিনে বড্ড বেশি করে রূপো কাকার কথা মনে পড়ে।' সাদামাটা দায়িত্বপূর্ণ এক আদর্শ নিষ্ঠাবান চরিত্র রূপো বাঙাল। আদর্শ ও দৃঢ়তার সমন্বয় ঘটিয়েছেন লেখক চরিত্রটির মধ্যে। বিভূতিভূষণের বেশির ভাগ চরিত্রই এমনি নিটোল, মমত্বময়। গভীর আন্তরিকতার সাথে তিনি সৃষ্টি করেছেন এদের। চরিত্রের এ বিকাশ গল্পের শিল্পমূল্যকে বৃদ্ধি করে।

Dhaka University Institutional Repository

'বারিক অপেরা পার্টি' (মুখোশ ও মুখশ্রী) গল্পের 'বারিক মণ্ডল' চরিত্রটি বিভূতিভূষণের সৃষ্ট একটি অনন্য সার্থক চরিত্র। কাঁচাপাকা দাঁড়িওয়ালা বারিক গান-বাজনার মহড়া দিয়ে অনাহার দারিদ্র্য ভুলে গলা ছেড়ে গান গায়। নিজে মুসলমান, গান গায় 'শ্যাম লটবরের'। পাওনাদার গাই বলদ সর্বস্ব ক্রোক করে নিলেও বেহালার তার কেনে সে মহাজনের ধার শোধ না করে, ডুগি-তবলা কেনে মুসুরি বুনবার টাকা দিয়ে। মহাজন তাগাদা দিলে বারিক নির্বিকার তামাক সাজতে থাকে এবং বলে, 'আপনি নেয্য বলেচেন। টাকা ওরা দিইছিল, তা সংসারের জ্বালা, সে টাকা মোর খরচ হয়ে গিয়েছে। তবলা ছাইতে খরচ হোল তিন টাকা। বেহালার তার এনেলাম মুকুন্দ তেলির দোকান থেকে।' বারিক মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর, ফাঁকিবাজ, কিন্তু কী আশ্চর্য মনোমোহন। গল্পের শেষে দেখা যায় সদাহাস্যময় বারিক ছেলে দু'টোকে নিয়ে 'সাধনসমর' বা 'অজামিলের বৈকুণ্ঠ লাভ' পালার রিহার্সেল দিতে দিতে বড় ছেলেটি মারা গেল অকস্মাৎ। তবুও শেষ হয়না 'বারিক অপেরা পার্টির' জয়যাত্রা। গল্পের শেষ আসরে গিয়ে দেখি, বারিক বিদূষকের ভূমিকায় দাঁড়ি নেড়ে খুব লোক হাসাচ্চে, পালা হচ্ছে 'সাধনসমর' বা 'অজামিলের বৈকুণ্ঠ লাভ'। বারিক চরিত্রটি বিভূতিবিভূষণের সৃষ্ট একটি অনন্য, অসাধারণ চরিত্র।

বিভূতিভূষণের সৃষ্ট চরিত্রগুলো যেন তাঁরই প্রতিরূপ। শঠ, প্রবঞ্চক কোন চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেন নি। চারপাশের দেখা, চেনা, জানা সাধারণ মানুষদেরই তিনি আশ্রয় দিয়েছেন তাঁর ছোটগল্পে। আর সেখানে এই সাধারণ চরিত্রগুলো ব্যঞ্জনার মহিমায় হয়ে উঠেছে অসাধারণ। যে চরিত্রের যেটুকু অনিবার্য স্পন্দন অনুভব করেছেন, সেটুকুই তিনি লিখে রেখেছেন। যে চরিত্র তিনি দেখেছেন, সে চরিত্রের যতটুকু স্বাভাবিক, তাই তিনি এঁকেছেন গভীর মমতায়। বাহুল্য বা আতিশয্য তাঁর ধর্ম নয়। যে চরিত্রের যা স্বাভাবিক পরিণতি, অসাধারণ কোন পরিণতির অপেক্ষা না করেই সেখানেই তিনি শেষ করেন তাঁর লেখা। বলা যায় চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তিনি সংযমী এবং আন্তরিক। তাই তাঁর গল্পের চরিত্ররা এত মানবিক, এত প্রান্তবন্ত; এত সজীব ও বাস্তবানুগ। আর চরিত্র সৃষ্টির এ সাফল্যের জন্য তাঁর ছোটগল্প হয়েছে শিল্পসম্মত।

প্লট বা আখ্যান ছোটগল্প শিল্পের অন্যতম একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য। প্লটকে কাহিনীকাঠামো বা কাহিনীবৃত্ত বা ঘটনা বা রূপরেখাও বলা যেতে পারে। গল্পের মূল শর্তই হচ্ছে ঘটনা বা কাহিনীবৃত্ত। কাহিনীবৃত্ত চরিত্রগুলোকে স্রোতের টানে ভাসিয়ে নেয়, বেগবান করে। তাই আখ্যান পরিকল্পনায় যে যত যথার্থ শক্তিশালী, তাঁর গল্প তত সার্থক ও শিল্পসফল। অবশ্য সাম্প্রতিকতম ছোটগল্পে আখ্যানবৃত্ত তুচ্ছ। মানুষের চেতনার অন্তর্গত দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সংশয়ই মুখ্য হয়ে ওঠে ঘটনাকে ছাপিয়ে।

বিভূতিভূষণের গল্পে ঘটনা বিরলতা থাকলেও চরিত্রের আন্তর্সংঘাত লক্ষণীয় নয়। তিনি চারপাশের দেখা বা শোনা ঘটনার বিবৃতি দিতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে শিল্পের সংযম বা সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলেছেন। 'ঘটনার অতিবিরলতা বিভূতিভূষণের পরিণত জীবনের গল্পের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। বিভূতিভূষণ যে অতি সাধারণ নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য জীবন-পরিবেশ থেকে গল্পের উপকরণ সংগ্রহ করতেন, সেখানে সবসময় বর্ণবহুল নাটকীয় ঘটনা ঘটে না, প্রাত্যহিক জীবনের বৈচিত্র্যহীনতাই সেই পরিবেশের নরনারীর একমাত্র অবলম্বন। তাদের জীবনের সেই অতি-অকিঞ্চিৎকর উপকরণ এক

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ মুহূর্তে লেখকের নিজস্ব মুড বা মানসিক অবস্থার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এক অর্থবহ গভীর ব্যঞ্জনা নিয়ে।'[১৩] চারপাশের দেখা জগৎকে বিভূতিভূষণ চিত্রিত করেছেন আপন মনের রঙের তুলিতে সেখানে কাহিনীর তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ উত্থান-পতন নেই; পাত্র-পাত্রীর জীবনে তরঙ্গবিক্ষেপের ভাঙা-গড়া নেই। শুধু স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁদের। তাই ঘটনা বা কাহিনীর বিশেষ কোন চমক নেই তাঁর অধিকাংশ গল্পেই। তবুও গল্পগুলো শিল্পসাফল্যে উৎরে গেছে লেখকের অকৃত্রিম অনুরাগে গল্পশরীর নির্মাণের ফলে। "কাহিনী ও ঘটনাকে একেবারে সহজ, সরল, সাদামাটা রেখে গল্প বা উপন্যাসের আধারের শিল্প মর্যাদাকে বড় গৌরব দানের ক্ষমতা সেকালে একমাত্র বিভূতিভূষণের লেখনীতেই অসামন্য মূল্য পেয়েছে - এ ব্যাপারে অন্য গল্পকার থেকে বিভূতিভূষণের স্বাতন্ত্র্য স্থায়ী।"[১৪]

বিভূতিভূষণের অধিকাংশ গল্পেই আখ্যান রয়েছে, তবে আখ্যান পরিকল্পনা নেই। আধুনিক ছোটগল্পে আখ্যানের চেয়ে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বেশি গুরুত্ববহ। বিভূতিভূষণের বেশির ভাগ গল্পেই মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত অনুপস্থিত। যে গল্পে প্লট বা আখ্যানের প্রাধান্য নেই, সে গল্পেও চেতনাগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই। বিভূতিভূষণের অভিজ্ঞতা এত ঘটনাবহুল যে গল্পের প্লট নিয়ে তাঁকে বিশেষ ভাবতে হয় নি। চারপাশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঘটনা অবলীলায় তাঁর গল্পের প্লট হয়ে গেছে। দিনলিপির পাতা থেকে স্মৃতিরা প্লট হয়ে গেছে গল্পের। তাই আখ্যানবৃত্তকে সুপরিকল্পিতভাবে তিনি গল্পে উপস্থাপন করেন নি। সেটা তাঁর দুর্বলতা নয়, উদাসীনতা। কিছু কিছু গল্পে অখ্যানবৃত্ত নেই বললেই চলে।

'তুচ্ছ'(অসাধারণ),'একটি দিন' (জন্ম ও মৃত্যু), 'মাকাললতার কাহিনী' (অসাধারণ), 'দিবাবসান' (জ্যোতিরিঙ্গণ), 'মানতালাও' (কুশল পাহাড়ী), 'একটি ভ্রমণ কাহিনী' (উপল খণ্ড) ইত্যাদি গল্পে বিশেষ কোন প্লট বা আখ্যানবৃত্ত নেই। কিন্তু বেশির ভাগ গল্পেই বিভূতি ভূষণের আখ্যান সুন্দর। তিনি আখ্যান নির্মাণ করেন নি। পরিকল্পনা করেন নি। তাই তা নিটোল নয়। 'মেঘমল্লার' (মেঘমল্লার), 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল', (নবাগত), ' আহ্বান '(উপল খণ্ড), 'হিংয়ের কচুরি' (জ্যোতিরিঙ্গণ), 'বামা' (তাল নবমী) প্রভৃতি গল্পে প্লট নির্মাণে বিভূতিভূষণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্লট বা আখ্যানবৃত্ত হচ্ছে গল্পের কাঠামো। তাকে ঘিরেই গল্পশরীর গড়ে ওঠে। বিভূতিভূষণের গল্পের প্লট অনায়াসলব্ধ। তাই তা সুন্দর; কিন্তু শিল্পসফলতা সব সময় লাভ করতে সক্ষম হয় নি। নির্মাণের দক্ষতায় তাকে পরিমার্জিত করলে গল্পের পল্ট আরও উৎকৃষ্ট হতে পারতো।

ছোটগল্পের অন্যতম প্রধান একটা বৈশিষ্ট্য 'নাটকীয়তা'। গল্পের শুরু এবং শেষ হবে নাটকীয়। সংলাপ রচনায় এবং কাহিনী নির্মাণে নাট্যকৌশল গল্পকে মাধুর্য দান করে। কোন রকম ভূমিকার অতিরঞ্জন ছাড়াই ছোটগল্পের শুরু হবে। শেষও হবে হঠাৎ। সমাপ্তিতে পাঠকচিত্তে অতৃপ্তির অনুরণন গল্পকে চমৎকার মহিমা দান করে। এ নাট্যিক গুণ ছোটগল্পের একটা বিশেষ টেকনিক। বিভূতিভূষণের বেশির ভাগ ছোটগল্পে এ কৌশলটি অনুপস্থিত। গল্পের শুরুর আগেও মনে হয় একটা শুরু থাকে এবং শেষ হবার পরেও কাহিনী চলতে থাকে। অতল রহস্য গভীর সমুদ্রে পতনের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

সাথেই নদীর সমাপ্তি যেমন, ছোটগল্পেও তেমনি সমাপ্তির রহস্য জটিলতা লক্ষণীয়। কিন্তু বিভূতি-ছোটগল্পে তার অভাব দৃষ্ট। অবশ্য গল্পের ভেতরে কোথাও কোথাও এ রকম নাটকীয়তা দেখা যায়। অল্প সংখ্যক ছোটগল্পেই এ নাটকীয়তা রয়েছে। খেলা (কুশল পাহাড়ী), উইলের খেয়াল (যাত্রা বদল), ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল (নবাগত), ফকির (উপলখণ্ড), মরফোলজি (ছায়াছবি), বামা (তাল নবমী), বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি (তাল নবমী), উড়ুম্বর (মুখোশ ও মুখশ্রী), রাসু হাড়ি(মুখোশ ও মুখশ্রী), বারিক অপেরা পার্টি (মুখোশ ও মুখশ্রী), ফড়খেলা (ক্ষণভঙ্গুর) ইত্যাদি গল্পে নাটকীয়তা সৃষ্টিতে সফলতা দেখা যায়।

'বামা' গল্পে কথক ভুলক্রমে ফাঁসুড়ে ডাকাতদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে রাতে। রাতে রান্নার সময় হঠাৎ সে বাড়ির বউ কথকের কাছে এসে নিচু স্বরে বললো, "ঠাকুরমশায়, আপনি এখনই এখান থেকে পালান, না হলে আপনি ভয়ানক বিপদে পড়বেন - এরা ফাঁসুড়ে ডাকাত,রাতে আপনাকে মেরে ফেলবে।" বলেই বউটি চট করে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। একবার বাড়ির মধ্যে যায়, আবার দু'মিনিটের জন্য ফিরে এসে কথককে তালিম দিয়ে যায় - কী ভাবে রক্ষা পাবে, তাই। লেখক এ অংশে চমৎকার নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছেন। শেষ পর্যন্ত বউটির সাজানো নাটকে কথক রক্ষা পেলেন। পুরো গল্পটি বর্ণনায় নাট্যকৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

'খেলা' গল্পেও এরকম নাটকীয়তা রয়েছে। বাচ্চা ছেলেকে ভুলিয়ে রাখতে তার সাথে প্রায়ই খেলা করে বাবা মতিলাল। একবার নদীতে নাইতে নেমে ডুব দিয়ে আর ওঠে না মতিলাল। ছোট্ট ছেলে টুনু পারে দাঁড়িয়ে বাবাকে ডাকে। সে ভাবে - এটাও তার বাবার একটা খেলা। বস্তুত: মতিলাল কুমিরের পেটে গেছে। আর ফেরে নি। "খোকা আকুল কান্নার মধ্যে হাত বাড়িয়ে নদীর দিকে দেখিয়ে বলে - বাবা মতিলাল - ভয় করবে-'। গল্পটির নাট্যিক গুণ পাঠকচিত্তে এক বেদনাঘন আবহের সৃষ্টি করে।

'ফড়খেলা' গল্পে জুয়াড়িকে ঠকিয়ে যখন অনাদিবাবু একটার পর একটা দান জিতে সর্বমোট ছয় হাজার টাকা জিতলেন এবং জুয়াড়ির কাছে হাত বাড়িয়ে বললেন 'দাও', জুয়াড়ি পাংশু মুখে বললো -'বাবু, আর আমার কাছে কিছু নেই, হুজুর! এই দেখুন গেঁজে।গোটা কতক খুচরো টাকা সিকি দু'য়ানি পড়ে আছে' তখন গল্পটিতে ভারি চমৎকার এক নাটকীয় আবহের সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের নাটকীয়তা সৃষ্টিতে বিভূতিভূষণ সফল অনেক ছোটগল্পেই।

'মরফোলজি' গল্পের শেষে দেখি এরকম নাটকীয়তা। সুন্দরী চেনাচেনা মেয়েটিকে প্র্যাকটিক্যালে সাহায্য করে তার পরিচয় জানতে চাইলেন প্রৌঢ় অধ্যাপক। মেয়েটি পরিচয় দিলে বুঝলেন সে অধ্যাপকেরই কলেজ জীবনের প্রেমিকা নির্মলার মেয়ে। পরিচয় পেয়ে অধ্যাপকের মাথা ঘুরে উঠলো। গল্পের এখানেই শেষ। নাট্যিক কৌশল সৃষ্টিতে এ গল্পে লেখক সফল।

Dhaka University Institutional Repository

বিভূতিভূষণের অধিকাংশ গল্পেই এ নাটকীয়তার অভাব থাকলেও বেশ কিছু গল্পে তিনি নাটকীয়তা সৃষ্টিতে সফল। তার ফলে তাঁর ছোটগল্প শিল্পসাফল্য লাভ করেছে।

ছোটগল্পের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যঞ্জনধর্মিতা। গল্পের কাহিনী বা বর্ণনা হবে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বা ব্যঞ্জনাবহ। ছোটগল্পে থাকবে বক্তব্যের অতীত কোন বক্তব্য, যা পাঠকচিত্তে সূক্ষ্ম অথচ গভীর কোন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করবে। বিভূতিভূষণের অধিকাংশ ছোটগল্পেই ব্যঞ্জনার অভাব দৃষ্ট। কিছু কিছু গল্পে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি সার্থক হয়েছে। পুঁইমাচা (মেঘমল্লার), বুধীর বাড়ি ফেরা (কিন্নর দল), সই (জন্ম ও মৃত্যু), দ্রবময়ীর কাশীবাস (নবাগত), প্রত্যাবর্ত্তন (নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব), দাদু (জ্যোতিরিঙ্গণ), বুধোর মায়ের মৃত্যু (ক্ষণভঙ্গুর), ভণ্ডুল মামার বাড়ি (যাত্রা বদল) ইত্যাদি গল্পে ব্যঞ্জনা সৃষ্টির প্রয়াস রয়েছে।

'পুঁইমাচা' গল্পে শেষে দেখি প্রবর্ধমান নধর পুঁইচারার বেড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে ক্ষেন্তির মৃত্যুকে লেখক গভীর ব্যঞ্জনাবহ ও মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। 'বুধীর বাড়ি ফেরা' গল্পে কসাইখানার নির্মমতা বর্ণনা এবং বুধীর কষ্টকর প্রতিক্রিয়া ও মুক্তির আকুলতা অবশ্যই ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। মানুষের পাশবিকতা ও পশুর মানবিকতা গল্পে বিধৃত। ব্যঞ্জনা সৃষ্টি দেখি 'ভণ্ডুল মামার বাড়ি' গল্পে। 'ভণ্ডুল মামার বাড়ি উঠছে আজ থেকে নয়, জীবনের পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধরে... যেন অনন্তকাল, অনন্ত যুগ ধরে ভণ্ডুল মামার বাড়ির ইট একখানির পর আর একখানি উঠছে.....'। গল্পের এ অংশ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বর্ণনায় ব্যঞ্জনধর্মিতা স্পষ্ট। বিভূতিভূষণের গল্পে ভাষার স্নিগ্ধ পরশ কখনও কখনও এ রকম ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সার্থক। কিন্তু তা খুব কম গল্পেই। বেশির ভাগ গল্পেই ব্যঞ্জনধর্মিতা অনুপস্থিত।

আধুনিক ছোটগল্পের অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য 'ইঙ্গিতময়তা'। গল্পের শুরুতেই গল্পের পরিণতির ইঙ্গিত থাকবে। শুরুর মধ্যেই শেষের রহস্য নিহিত থাকবে ছোটগল্পে। পরবর্তীর প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছোটগল্পকে শিল্পসফলতা দান করে। বিভূতিভূষণের কোন কোন গল্পে ইঙ্গিতময়তা রয়েছে। কিন্তু তা প্রকট নয়। গল্পের প্রচলিত প্রকরণ বা টেকনিক এর প্রতি তাঁর উদাসীনতাই তার কারণ। 'মেঘমল্লার' (মেঘমল্লার) গল্পের শুরুতেই এ রকম ইঙ্গিতময়তা রয়েছে - "দশপারমিতার মন্দিরে সেদিন সাপুড়ের খেলা দেখবার জন্য অনেক মেয়েপুরুষ মন্দির প্রাঙ্গণে একত্র হয়েছিল, তারই মধ্যে প্রদ্যুম্ন প্রথমে লোকটিকে দেখে। ..... একজন বিখ্যাত গায়ক ও বীণ-বাজিয়ে আসবেন।" শুরুতেই কোন রহস্যের ইঙ্গিত রয়েছে গল্পটিতে। ইঙ্গিতময়তা রয়েছে 'পুঁইমাচা' (মেঘমল্লার) গল্পের শুরুতেও। "সহায়হরি চাটুয্যে উঠানে পা দিয়েই স্ত্রীকে বললেন - একটি বড় বাটি কি ঘটি যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভাল রস আনি" - কোন লোবের ইঙ্গিত দেয় যা পরবর্তিতে ক্ষেন্তির চরিত্রে প্রকাশিত হয় এবং পুরো গল্পেই এই লোভের চিহ্ন রয়েছে। বেশ কিছু গল্পে এ রকম ইঙ্গিতময়তা রয়েছে এবং গল্পকে শিল্পসুষমা দান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সার্বিকভাবে বিভূতিভূষণের গল্পের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বলা যায়, ছোটগল্পের আঙ্গিক, প্রকরণ ও রীতি-পদ্ধতির দিক থেকে বিভূতিভূষণ প্রচলিত রীতির প্রতি উদাসীন ছিলেন। ফলতঃ তাঁর বিপুল সংখ্যক গল্পের মধ্যে খুব কমই শিল্পসাফল্য লাভ করেছে। তাঁর ভাষা ব্যবহারের শৈলী পাঠকের দৃষ্টি অনেকটা আচ্ছন্ন করে রাখে। ফলে অন্যান্য প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের অভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁর গল্পগুলো শিল্পসার্থকতার মানদণ্ডে উৎরে গেছে। বলা যায় বিভূতিভূষণের ছোটগল্প বাংলা ছোটগল্পে নতুন ধারা সৃষ্টি করে গল্পসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

খ. শিল্পরূপ

তথ্য সূত্র

১। বিভূতিভূষণঃ মন ও শিল্প। গোপিকানাথ রায় চৌধুরী। দেজ পাবলিশিং। এপ্রিল ১৯৯৬। পৃঃ ১১।
২। ঐ। পৃঃ ১৩।
৩। ঐ। পৃঃ ১৪।
৪। বাংলা ছোটগল্পঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ। বীরেন্দ্র দত্ত। পুস্তক বিপণি। মে ১৯৯৫। পৃঃ২০।
৫। বিভূতিভূষণঃ আধুনিক জিজ্ঞাসা। সম্পাঃ অরুণ সেন। প্রবন্ধঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্য আকাদেমি। ১৯৯৭। পৃঃ৬০।
৬। বিভূতিভূষণ ঃ মন ও শিল্প। ঐ। পৃঃ১৪৫।
৮।ঐ। পৃঃ ১৮৫।
৯। বিভূতি রচনাবলী। দ্বাদশ খণ্ড। পৃঃ ৩৫০।
১০। বিভূতি রচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড। ভূমিকা।
১১। বিভূতিভূষণঃ জীবন ও সাহিত্য। সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ২৫৫।
১২। বাংলা ছোটগল্পঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ। ঐ।পৃঃ ১৪৬।
১৩। বিভূতিভূষণঃ মন ও শিল্প। ঐ। পৃঃ ১৪৪।
১৪। বাংলা ছোটগল্পঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ। ঐ। পৃঃ ১৩৮।

*****

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বিভূতিভূষণ বাংলার পথিক কবি। পথের দু'পাশে যা দেখেছেন, তা-ই হয়েছে তাঁর সাহিত্যের উপকরণ। অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষুদ্র কোন বিষয়ও তাঁর অনুভূতির ছোঁয়ায় হয়ে উঠেছে মহৎ। উপেক্ষিত, অবহেলিত জীবনকে তিনি সাহিত্যে রূপ দান করেছেন গভীর মমতায়। মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর ছিল নিবিড় টান। প্রকৃতির সাথে তাঁর ছিল আত্মিক সম্পর্ক। আর তাই সে সবই অবলীলায় হয়েছে তাঁর সাহিত্যের বিষয় ও উপকরণ।

বিভূতিভূষণ যুগের সৃষ্টি নন। যুগের স্রষ্টাও নন। সমকাল তাঁর সাহিত্যে বিধৃত নয়। তিনি আবহমান বাংলার প্রকৃতি ও জীবনকে উপস্থাপন করেছেন তাঁর সাহিত্যে। তাই তাঁর সাহিত্যে দেশ, কাল, সমাজ রয়েছে, কিন্তু ভিন্নভাবে। তিনি যেন বর্তমানে থেকে অতীত আর ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেছেন। যুগযন্ত্রণা তাঁকে স্পর্শ করে নি, আপ্লুত করে নি। দর্শকের দৃষ্টিতে তিনি যা দেখেছেন, সাহিত্যে তা-ই বর্ণনা করে গেছেন। অভিজ্ঞতার সাদামাটা উপস্থাপন তাঁর সাহিত্য।

কিন্তু সহজ, সরল জীবন কাহিনী, প্রাঞ্জল ভাষায় এমন চমৎকারভাবে তিনি উপস্থাপন করেছেন যে প্রাজ্ঞ পাঠকও শিশুর মতো তাঁর সে গল্পের শ্রোতা বনে যান। গভীর আন্তরিকতার সাথে তিনি তাঁর চারপশের জীবন ও প্রকৃতিকে সাহিত্যে বাস্তবানুগভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর বিষয় তাঁর বর্ণনার গুণে হয়ে উঠেছে গুরুত্ববহ। এ ধারার তিনিই স্রষ্টা। তিনিই প্রথম। সেখানেই তিনি অনন্য।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো ছোটগল্পেও তিনি সমান সফল ও কৃতিত্বের দাবিদার। দুইশতাধিক ছোটগল্পে তিনি তার সে স্বাক্ষর রেখেছেন। ছোটগল্পই যেন বিভূতিভূষণের স্বক্ষেত্র। 'ছোট প্রাণ, ছোট ব্যাথা, ছোট ছোট দুঃখ-কথা'কেই যেন তিনি উপজীব্য করেছেন তাঁর সব ছোটগল্পের। তাঁর যাবতীয় ছোটগল্পই তাঁর অভিজ্ঞতার ফসল। তাঁর গল্পগুলো যেন তাঁর 'দিনলিপি'রই খণ্ড খণ্ড অংশ। গল্পের কাহিনী, বর্ণনা, বিষয়, উপকরণ সব কিছুই তাঁর চেনা, জানা পরিবেশ থেকে আহৃত।

জীবনের প্রতি বিভূতিভূষণের ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। তিনি ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমিক। তাই মুগ্ধ দর্শকের মতো তিনি দেখে গেছেন বাংলার প্রান্তর-বিস্তৃত জীবন-প্রবাহ। খণ্ড খণ্ড বিশেষকে ঘিরে সারাজীবন তাঁর যে অভিজ্ঞতা, যে মুগ্ধতা, যে সমবেদনা, যে সহানুভূতি, যে যন্ত্রণা, যে জীবন-জিজ্ঞাসা অবলীলায় তাকে শিল্পীর স্বতস্ফূর্ত আবেগে গেঁথে গেঁথেই তিনি স্পর্শ করেছেন সাহিত্যিক উৎকর্ষের সীমাকে। সেই সব খণ্ড খণ্ড অনুভূতিকে তিনি দান করেছেন ছোটগল্পের মহিমা। শ্রবণের বিপুল সঞ্চয় আর অফুরন্ত দেখে যাওয়ার চোখ ছিল বিভূতিভূষণের। সে চোখ দিয়ে তিনি শুধু নিসর্গ দেখেন নি, মানুষকে দেখেছেন; বঞ্চিত, অবহেলিত জীবনকে দেখেছেন; দেখেছেন নির্বিশেষ জীবনের বিশেষকে। পথিক জীবনের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিসঞ্জাত নির্যাসকেই তিনি স্থান দিয়েছেন তাঁর ছোটগল্পে।

Dhaka University Institutional Repository

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের বিষয়গত বৈচিত্র্য উপন্যাসের চেয়ে অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয়। বিভূতিভূষণের মৌল দৃষ্টিভঙ্গির প্রিজমেই বিচিত্র বিষয় নানা বর্ণে বিচ্ছুরিত। তাঁর চেতনার আলো নানা উপকরণের মধ্য দিয়ে ছোটগল্পে বিকীর্ণ। জীবনের যে বিচিত্র গভীর রস ও রহস্য তাঁর চেতনায় ধরা দিয়েছে, তা-ই শিল্পিত রূপ পেয়েছে তাঁর অজস্র গল্পের নানা খণ্ড আয়তনে। তাঁর গল্পের মূল বিষয় প্রকৃতি ও মানুষ হলেও, বেশিরভাগ ছোটগল্পেই প্রকৃতির চেয়ে মানুষের প্রাধান্যই বেশি। আর এই মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচয়-সন্ধানই তাঁর অন্বিষ্ট। ছোটগল্পে এই সাধারণ নগন্য মানুষেরা হয়ে উঠেছে প্রধান বিষয়। তাঁদের জীবনভূমির বিচিত্র খণ্ডিত দর্পণে বিম্বিত অতি ছোট, তুচ্ছ বিষয় অকৃত্রিম মমতায় বিভূতিভূষণ তাঁর ছোটগল্পের উপাদান করেছেন। জীবন ও জগতের উপেক্ষিত, বর্ণহীন উপকরণ তাঁর গল্পের উপাদান করেছেন। জীবন ও জগতের উপেক্ষিত, বর্ণহীন উপকরণ তাঁর গল্পের বিষয়। প্রতিদিনের পথের ধুলোয় ছড়িয়ে থাকা বর্ণবিরল তুচ্ছ জীবনের টুকরো ছবির মুক্তোয় যেন তিনি ছোটগল্পের মালা গেঁথেছেন। বিষয়ের বিচিত্র রঙে চিত্রিত সেই সব টুক্‌রো ছবি বিভূতিভূষণের সহানুভূতিতে হয়ে উঠেছে বাস্তব ও প্রাণবন্ত।

এত বিষয়বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও নিছক বিষয়ের মূল্যই বেশি গুরুত্ব পায় নি বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে। একটু লক্ষ্য করলেই তাঁর ছোটগল্পের স্বতন্ত্র এক বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যাবে, যা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। জীবন দৃষ্টির এই একান্ত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যই তাঁর ছোটগল্পকে অর্থবহ করে তোলে, বিষয় বৈচিত্র্য নয়। অবশ্য বিষয়ের দিক থেকে অনেকাংশে অভিনব হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অনেক ছোটগল্পই তেমন রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি, লেখকের মনোযোগ বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার কারণে। আপন শিল্পিসত্তার গভীর চেতনার স্পর্শে লেখক সেখানে বিষয়ের উত্তরণ ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

বিভূতিভূষণের বেশ কিছু গল্প সার্থক হলেও অধিকাংশই শিল্পসফল নয়। গল্পের প্রকরণগত সীমাসংহতি সম্বন্ধে তিনি খুব বেশি সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না । তবুও গল্পগুলো চিত্তস্পর্শী হয়ে উঠেছে লেখকের কথনরীতির সহজাত বৈশিষ্ট্যে। তাঁর জীবনগত অভিজ্ঞতা ও জীবনদৃষ্টি ছোটগল্পের সীমিত অবয়বে এক বিশেষ তাৎপর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁর অনেক সার্থক ছোটগল্পেই ঘটনা, চরিত্র বা অনুভূতি একটি পরম মুহূর্তের অনুবিশ্বে সংহত হয়ে জীবন- উপলব্ধির এক বিশাল গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। লেখক ঐকান্তিক সংবেদনা ও মমত্ব নিয়ে বিষয়বস্তুর একমুখী গতির টানে পৌঁছে গেছেন অনুভূতির এক চূড়ান্ত মুহূর্তে। তাই তাঁর গল্প সেখানেই যথার্থ স্বকীয়তা পেয়েছে। হয়ে উঠেছে শিল্পসফল।

বিভূতিভূষণের বেশিরভাগ গল্পেই বিশেষ কোন বক্তব্য নেই। যেন গল্প বলার জন্যই গল্প বলা। ক্ষুধার কথা আছে, কষ্টের কথা আছে,আছে সমাজের নানা বৈষম্যের কথা। কিন্তু নেই তার কোন বহিঃপ্রকাশ বা প্রতিক্রিয়া। যন্ত্রণা তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে, কিন্তু প্রতিবাদী করে তোলে নি। জীবন বেদনা ও যুগযন্ত্রণার তরঙ্গ-মন্থনে উত্থিত কোন হলাহল তিনি পান করে 'নীলকণ্ঠ' হন নি। তিনি যেন নিরাবেগ যোগীর মতো ভাবলেশহীনভাবে গল্প বলে গেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক কোন দায়বদ্ধতা তাঁর ছিল বলে মনে হয় না তাঁর ছোটগল্পে। স্বকাল ও স্বদেশ তাঁর ছোটগল্পে প্রস্ফুটিত কিন্তু বিকশিত নয়। বরং অতীতমুখীনতা তাঁর উপন্যাসের মতো ছোটগল্পেও বেশি প্রকটিত। সে অতীত যেন তাঁকে পেছন থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, সামনে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গুলি নির্দেশ করে না। তাঁর বেশিরভাগ ছোটগল্পই তাই স্মৃতির ভারে ক্লিষ্ট; নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত। তাই তিনি স্বকালের হয়েও যেন অন্যকালের। কি বিষয় বৈচিত্র্যে, কি শিল্পরীতিতে তিনি স্বতন্ত্র যুগরহিত। গল্প রচনার সামসময়িক প্রচলিত প্রকরণ-পদ্ধতি বা শিল্পরীতি প্রায় সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে তিনি একেবারে নিজস্ব স্টাইলে, নতুন পথে চলেছেন। সে পথের তিনিই একমাত্র পথিক।

প্লট বা আখ্যান নির্মাণেও ঘটনার আড়ম্বরহীনতা তাঁর একটা মূল বৈশিষ্ট্য। কাহিনীর যে কোন স্থান থেকেই তিনি যেন গল্প বলা শুরু করে দেন। বলতে বলতে ভেসে চলেন স্রোতের টানে; পৌঁছে যান গন্তব্যহীন গন্তেব্যে। 'শেষ হয়েও হইলো না শেষ' - এর অতৃপ্তি থাকে না। যেখানে কাহিনীর সমাপ্তি হলে ছোটগল্পের শিপ্পরস ব্যহত হতো না, সেখানেও তিনি থামেন নি। চলেছেন চলার আবেগে, বলেছেন বলার আবেশে। ছোটগল্পশিল্পীর, তথা যে কোন শিল্পী-সাহিত্যিকের সৃষ্টির ক্ষেত্রে নির্মম ও কঠোর হতে হয়; চরিত্র ও কাহিনী নির্মাণে নির্মোহ থেকে শিল্পরস সৃষ্টিতে সচেতন থাকতে হয় একজন ছোটগল্প লেখককে। বিভূতি সে ক্ষেত্রে বেহিসেবী। তিনি তাঁর আবেগকে ভাষারূপ দিয়েছেন গল্পের পরিণতির পরেও অধিকাংশ গল্পেই।

ছোটগল্পে 'পরম মুহূর্ত' সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বিভূতিভূষণ। অথচ তাঁর অধিকাংশ গল্পেই সে 'মুহূর্ত' সৃষ্টির অভাব দেখা যায়। ছোটগল্পশিল্পের একটা অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য নাটকীয়তা। তাঁর বেশির ভাগ গল্পেই এই নাটকীয়তার অভাব পরিলক্ষিত হয়। কোথাও কোথাও তিনি গল্পের মধ্যে চমক সৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছেন। চমক সৃষ্টি বা গল্পের শেষে Surprise দেয়ার রীতি তিনি বর্জন করেছেন। ছোটগল্পের প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি, শিল্প-কৌশল উপেক্ষা করে তিনি আপন মনে পথ চলেছেন যেন আত্মভোলা পথিক-সত্তা।অধিকাংশ গল্পেই ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অনেক স্থানেই ব্যঞ্জনা সৃষ্টির চেষ্টাও করেন নি। প্রকরণের দিক থেকে কেন্দ্রীয় সংহতি বা অবয়বের দৃঢ়বদ্ধতার ক্ষেত্রেও যেন তিনি উদাসীন ছিলেন। তিনি যেন ছোটগল্প লেখার জন্য ছোটগল্প লেখেন নি, লিখেছেন মনের পটে ভেসে ওঠা দৃশ্যমান কোন ভাবকে মূর্তিমান করার আন্তর্তাগিদে। সেখানে তিনি বিষয়, চরিত্র - এদের সাথে একাত্ম। আবেগে চলায় আত্মহারা। শিল্পের শৃঙ্খলে তিনি জড়ান নি নিজকে।

এত কিছুর পরেও বিভূতিভূষণের ছোটগল্প পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট করে তাঁর বিষয় এবং বর্ণনার গুণে। গল্প বলার ঢঙে। তাঁর গল্পের বিষয় এমনই জীবন ঘনিষ্ঠ, যা সকলের মনকে আপ্লুত করে। আর সে বিষয়ের বাস্তবনিষ্ঠ উপস্থাপন সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও প্রসাধনহীন ভাষায়। পাঠক যেন বিমোহিত চিত্তে গল্পকথকের মুখে গল্প শুনতে থাকেন।উদ্বেলিত হন। আবেগ মথিত হন। গল্পের শিল্পসার্থকতা খোঁজেন না, সন্ধান করেন গল্পরস। ব্যস্তজটিল জীবন-যন্ত্রণা থেকে দু'মুহূর্ত দূরে থাকতে চান। তাই বিভূতিভূষণ, বিভূতি-ছোটগল্প জনপ্রিয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যকে নতুন পথের সন্ধান দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন বিভূতিভূষণ। অবশ্যই তাঁর এ সৃষ্ট নতুন ধারা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যকে এ ধারা উৎকর্ষ দান করেছে। তাই বাংলা ছোটগল্পের সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনে বিভূতিভূষণের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ছোটগল্পের শিল্পরীতির মাপকাঠিতে তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পই সার্থক না হলেও বেশ কিছু সার্থক ছোটগল্প রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি।

বাংলা সাহিত্যের সার্থকনামা ছোটগল্পগুলোর সাথে বিভূতিভূষণের রচিত সেই সার্থক ছোটগল্পগুলো একই পঙ্‌ক্তিতে স্থান পাওয়ার দাবিদার। সে কারণেই বিভূতিভূষণের ছোটগল্প আরও অধিক করে পাঠ ও গভীরতর বিশ্লেষণ, আলোচনা-পর্যালোচনার প্রয়োজন। বিভূতিভূষণকে প্রয়োজন নবতর মূল্যায়নের। তাঁর বিপুল সাহিত্যসম্ভার এবং বিপুল সংখ্যক ছোটগল্প বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে যেমন সমৃদ্ধি দান করেছে, তেমনি দিয়েছে নতুন শিল্প-কৌশল ও নতুন পথের সন্ধান। তাই বিভূতিভূষণ চিরস্মরণীয়।

*****

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

ক. বিভূতিভূষণের গল্পসঙ্কলনপঞ্জি

১.মেঘমল্লার। শ্রাবণ ১৩৩৮। বরেন্দ্র লাইব্রেরি।
মেঘমল্লার, নাস্তিক, উমারাণী, বউ চণ্ডীর মাঠ, নববৃন্দাবন, অভিশপ্ত, খুকীর কাণ্ড, ঠেলাগাড়ী, পুঁইমাচা, উপেক্ষিতা।

২. মৌরীফুল। ভাদ্র ১৩৩৯। শ্রীগুরু লাইব্রেরি।
মৌরীফুল, জলসত্র,রোমান্স, রাক্ষসগণ, হাসি, প্রত্নতত্ত্ব, দাতার স্বর্গ, খুঁটিদেবতা, গ্রহের ফের, মরীচিকা।

৩. যাত্রাবদল। কার্তিক ১৩৪১। পি সি সরকার ।
ভণ্ডুলমামার বাড়ি, পেয়ালা, উইলের খেয়াল, কনে দেখা, সার্থকতা, একটি দিন, বাইশ বছর, বৈদ্যনাথ, ডানপিটে, যাত্রাবদল।

৪. জন্ম ও মৃত্যু। আশ্বিন ১৩৪৪। কাত্যায়নী বুক স্টল।
যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ, জন্ম ও মৃত্যু, সই, রামশরণ দারোগার গল্প, খুড়ীমা, বায়ুরোগ, অরন্ধনের নিমন্ত্রণ, লেখক, বড়বাবুর বাহাদুরি, অন্নপ্রাশন, তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প, ডাকগাড়ী, অকারণ।

৫. কিন্নর দল। কার্তিক ১৩৪৫। কাত্যায়নী বুক স্টল।
মণি ডাক্তার, পুরনো কথা, খোসগল্প, একটি দিনের কথা, বাটি-চচ্চড়ি, তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প, ডাইনী, বুধীর বাড়ী ফেরা, বিধুমাস্টার, উন্নতি, কিন্নর দল।

৬. বেণীগীর ফুলবড়ী। বৈশাখ ১৩৪৮। কাত্যায়নী বুক স্টল।
বেণীগীর ফুলবাড়ী, মাস্টারমশায়, তিরোলের বালা, জনসভা, প্রত্যাবর্তন, প্রাবল্য, বাঁশি, পাঁচুমামার বিয়ে, শান্তিরাম, কুয়াশার রঙ, ফিরিওয়ালা, নিষ্ফলা।

Dhaka University Institutional Repository

৭. নবাগত । মাঘ ১৩৫০ । মিত্র ও ঘোষ ।
দ্রবময়ীর কাশীবাস, আমার লেখা, ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল, পারমিট, মুক্তি, গায়ে হলুদ, ঠাকুরদার গল্প, ভিড়, আরক, থিয়েটারের টিকিট, পার্থক্য, স্বপ্নবাসুদেব ।

৮. তালনবমী । বৈশাখ ১৩৫১ । রমেশচন্দ্র ঘোষাল, কালিকা প্রেস ।
তালনবমী, রঙ্কিণী দেবীর খড়্গা, মেডেল, মসলাভূত, বামা, বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি, অরণ্যে, গঙ্গাধরের বিপদ, রাজপুত্র, চাউল ।

৯. উপলখণ্ড । বৈশাখ ১৩৫২ । গুপ্ত প্রকাশিকা ।
আহ্বান, একটি ভ্রমণকাহিনী, নসুমামা ও আমি, দৈবাৎ, বিড়ম্বনা, ভুবন বোষ্টুমী, শাবলাতলার মাঠ, পৈতৃক ভিটা, দুর্মতি, ফকির, আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা ।

১০. বিধুমাস্টার । জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ । কাত্যায়নী বুক স্টল ।
বাক্সবদল, মূলো র‍্যাডিশ-হর্স র‍্যাডিশ, সুলোচনার কাহিনী, বেচারী, অভয়ের অনিদ্রা, অসমাপ্ত, কবি কুণ্ডুমশায়, সঞ্চয়, সুহাসিনীমাসিমা, বিধুমাস্টার, অভিশাপ ।

১১. ক্ষণভঙ্গুর । ভাদ্র ১৩৫২ । গুপ্ত প্রকাশিকা ।
সিঁদুরচরণ, একটি কোঠাবাড়ীর ইতিহাস, বুধোর মায়ের মৃত্যু, ছেলেধরা, রামতারণ চাটুজ্যে অথর, নুটিমন্তর, ফড়খেলা, হাট, অরণ্যকাব্য ।

১২. অসাধারণ । বৈশাখ ১৩৫৩ । মিত্রালয় ।
অসাধারণ, নদীর ধারের বাড়ী, বিপদ, জন্মদিন, কাঠবিক্রি বুড়ো, হারুন অল রসিদের বিপদ, সুলেখা, রূপো বাঙাল, তেঁতুলতলার ঘাট, দুইদিন, মাকাললতার কাহিনী, বংশলতিকার সন্ধানে, কমপিটিশন, ব্ল্যাকমার্কেট দমন, তুচ্ছ, পিদিমের নিচে ।

১৩. মুখোশ ও মুখশ্রী । অগ্রহায়ণ ১৩৫৪ । মিত্র ও ঘোষ ।
মুখোশ ও মুখশ্রী, রাসু হাড়ি, দৈব ঔষধ, বারিক অপেরা পার্টি, উড়ুম্বর, মাছ চুরি, বেসাতি, কলহান্তরিতা, উল্টোরথ, মুক্তপুরুষ হরিদাস, অন্তর্জলি, বোতাম, খোলস, চৌধুরাণী ।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. আচার্য কৃপালনী কলোনি। আশ্বিন ১৩৫৫। বেঙ্গল পাবলিশার্স।
আচার্য কৃপালনী কলোনি, নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব, বরো বাগদিনী, প্রভাতী, সাহায্য, গিরিবালা, চিঠি, মড়িঘাটের মেলা, হাজারি খুঁড়ির টাকা, প্রত্যাবর্তন, পড়ে পাওয়া, আমার ছাত্র।

১৫. জ্যোতিরিঙ্গণ। চৈত্র ১৩৫৫। মিত্র ও ঘোষ।
সংসার, হিঙের কচুরী, দুইদিন, অনুশোচনা, দাদু, বাসা,বন্দী, খনটন কাকা, কালচিতি, দিবাবসান, মুস্কিল, গল্প নয়।

১৬. কুশল পাহাড়ী। পৌষ ১৩৫৭। মিত্র ও ঘোষ।
কুশল পাহাড়ী, ঝগড়া, বড় দিদিমা, অবিশ্বাস্য, খেলা, জাল, আবির্ভাব, মানতালাও, বেনিয়ম, অভিমানী, শিকারী, পরিহাস, জওহরলাল ও গড, গল্প নয়, সীতানাথের বাড়ি ফেরা, হরিকাকা, এমনই হয়, ঝড়ের রাতে, চাউল, পথিকের বন্ধু, আর্টিস্ট, শেষ লেখা।

১৭. রূপ হলুদ। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং।
ননীবালা, বিরজা হোম ও তার বাধা, বুড়ো হাজরা কথা কয়, কাশী কবিরাজের গল্প, ছোটনাগপুরের জঙ্গলে, মায়া, আমার ডাক্তারি, বর্শেলের বিড়ম্বনা, কাদা, ভৌতিক পালঙ্ক।

১৮. অনুসন্ধান। মাঘ ১৩৬৬। বিভূতি প্রকাশন।
অনুসন্ধান, টান, চ্যালারাম, সান্ত্বনা।

১৯. ছায়াছবি। ফাল্গুন ১৩৬৬। চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, তাপসী প্রেস।
ছায়াছবি, বিপদ, কবিরাজের বিপদ, আমোদ, সতীশ, অভিনন্দন সভা, মরফোলজি, ডালুর বিপদ।

Dhaka University Institutional Repository

খ. বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের প্রথম প্রকাশের তথ্য-তালিকা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলো গ্রন্থিত হওয়ার আগে কোন পত্রিকায় বা সঙ্কলনে কবে প্রথম প্রকাশিত হয়, তার একটি তালিকা দেয়া হলো। গল্পের নামের পাশে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে সেই গল্পসঙ্কলনের নাম দেয়া হলো , যেখানে গল্পটি প্রথম গ্রন্থিত হয়েছিল।

অনুসন্ধান (অনুসন্ধান)	সোনার বাংলা শারদীয় ১৩৫৪
অনুশোচনা (জ্যোতিরিঙ্গণ)	কল্যাণশ্রী অশ্বিন ১৩৫৬
অন্তর্জলি (মুখোশ ও মুখশ্রী)	গল্পভারতী বৈশাখ ১৩৫৫
অন্নপ্রাশন (জন্ম ও মৃত্যু)	বঙ্গশ্রী আশ্বিন ১৩৪৩
অভিনন্দনসভা (ছায়াছবি)	ছায়াপথ পূজা বার্ষিকী
অভিমানী (কুশল পাহাড়ী)	গল্পভারতী প্রথম বার্ষিকী ১৩৫৩
অভিশপ্ত (মেঘমল্লার)	প্রবাসী আষাঢ় ১৩৩১
অরণ্যে(তালনবমী)	সুনির্ম্মল বসু স. ছোটদের বার্ষিকী আরতী ১৯৩৮
অসমাপ্ত (বিধুমাস্টার)	দেশ সেপ্টেম্বর ১৯৪১
অসাধারণ (অসাধারণ)	সোনার বাংলা আশ্বিন ১৩৫২
আমার ডাক্তারি (রূপহলুদ)	কথা- সাহিত্য শারদীয় ১৩৫৮
আমোদ (ছায়াছবি)	দেশ শারদীয় ১৯৫০
আরক (নবাগত)	মৌচাক শারদীয় আশ্বিন ১৩৪৯
আহ্বান (উপলখণ্ড)	আনন্দবাজার পত্রিকা বার্ষিক দোল সংখ্যা ১৩৫০
উইলের খেয়াল (যাত্রাবদল)	প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৪০
উপসর্গ (বিভূতিরচনাবলী)	রঞ্জিত কুমার চট্টোপাধ্যায় কথা চয়ন ১৩৫৪
উপেক্ষিতা (মেঘমল্লার)	প্রবাসী মাঘ ১৩২৮
উমারাণী (মেঘমল্লার)	প্রবাসী শ্রাবণ ১৩২৯
উড়ুম্বর (মুখোশ ও মুখশ্রী)	দেশ শারদীয় ১৯৪৬
একটি কোঠাবাড়ীর ইতিহাস(ক্ষণভঙ্গুর)	দেশ এপ্রিল ১৯৪৫
একটি দিনের কথা (কিন্নর দল)	আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় ১৩৪৪
একটি ভ্রমণ কাহিনী (উপলখণ্ড)	দেশ ডিসেম্বর ১৯৪৪
এয়ারগান (বাক্সবদল)	দেব সাহিত্য পুটির প্রকাশিত সোনার কাঠি
কবি (সু ৬)	শনিবারের চিঠি আশ্বিন ১৩৫২
কবি কুঞ্জমশায় (বিধুমাস্টার)	দেশ অক্টোবর ১৯৪২
কবিরাজের বিপদ (ছায়াছবি)	উদয়ন পূজা বার্ষিকী ১৩৫৮

Dhaka University Institutional Repository

একটি ভ্রমণ কাহিনী (উপলখণ্ড)	দেশ ডিসেম্বর ১৯৪৪
এয়ারগান (বাক্সবদল)	দেব সাহিত্য পুটির প্রকাশিত সোনার কাঠি
কবি (সু ৬)	শনিবারের চিঠি আশ্বিন ১৩৫২
কবি কুণ্ডুমশায় (বিধুমাস্টার)	দেশ অক্টোবর ১৯৪২
কবিরাজের বিপদ (ছায়াছবি)	উদয়ন পূজা বার্ষিকী ১৩৫৮
কালচিতি (জ্যোতিরিঙ্গণ)	যুগান্তর আশ্বিন ১৩৫৫
কাশীক কবিরাজের গল্প (রূপহলুদ)	অভিষেক আশ্বিন ১৩৫৮
কিন্নর দল (কিন্নর দল)	পরিচয় শারদীয় ১৩৪৪
কুশল পাহাড়ী (কুশল পাহাড়ী)	কথা-সাহিত্য কার্তিক ১৩৫৭
খুকীর কাণ্ড (মেঘমল্লার)	প্রবাসী আশ্বিন ১৩৩৭
খুড়ীমা (জন্ম ও মৃত্যু)	প্রবাসী কার্তিক ১৩৪৩
খেলা (কুশল পাহাড়ী)	যুগান্তর শারদীয় ১৩৫৬
খোসগল্প (কিন্নর দল)	প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৫
গঙ্গাধরের বিপদ (তালনবমী)	মৌচাক কার্তিক ১৩৪১
গায়ে হলুদ (নবাগত)	দেশ শারদীয় ১৯৪৩
চ্যালারাম (অনুসন্ধান)	মৌচাক কার্তিক ১৩৪৩
ছোটনাগপুরের জঙ্গলে(রূপহলুদ)	বসুধারা আশ্বিন ১৩৬০
জন্ম ও মৃত্যু (জন্ম ও মৃত্যু)	দেশ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫
জলসত্র(মৌরীফুল)	গল্পলহরী কার্তিক ১৩৩৮
ঝগড়া (কুশল পাহাড়ী)	আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় ১৩৫৭
টান(অনুসন্ধান)	আনন্দবাজার পত্রিকা বার্ষিক দোলসংখ্যা ১৩৫৬
ঠেলাগাড়ী (মেঘমল্লার)	বিচিত্রা কার্তিক ১৩৩৫
ডানপিটে (যাত্রাবদল)	উদয়ন আশ্বিন ১৩৪১
তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প (জন্ম ও মৃত্যু)	প্রবাসী পৌষ ১৩৪৩
তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প (কিন্নর দল)	প্রবাসী আশ্বিন ১৩৪৫
তালনবমী (তালনবমী)	বুদ্ধদেব বসু স.মধুমেলা, ১৩৪৯ (পথ চেয়ে)
তিরোলের বালা (বেণীগীর ফুলবাড়ী)	প্রবাসী কার্তিক ১৩৪৭
দাতার স্বর্গ(মৌরীফুল)	গল্পলহরী বৈশাখ ১৩৩৮ (জমা-খরচ নামে)
দুই দিন (অসাধারণ)	বর্ষশ্রী পূজাবার্ষিকী ১৩৫২
ননীবালা (রূপহলুদ)	আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় ১৩৫৫
নববৃন্দাবন (মেঘমল্লার)	বিচিত্রা বৈশাখ ১৩৫৫
নাস্তিক (মেঘমল্লার)	প্রবাসী পৌষ ১৩৩১
পার্থক্য (নবাগত)	দেশ নভেম্বর ১৯৪৩
পিদিমের নিচে (অসাধারণ)	শারদীয় দৈনিক কৃষক ১৩৫২
পুঁইমাচা (মেঘমল্লার)	প্রবাসী মাঘ ১৩৩১
পেয়ালা (যাত্রাবদল)	প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৩৯

Dhaka University Institutional Repository

বাক্সবদল (বিধুমাস্টার)	বঙ্গশ্রী কার্তিক ১৩৪৭
বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি (তালনবমী)	সুধীরচন্দ্র সরকার স. শিশুগল্পিকা ১৩৪৩
বাসা(জ্যোতিরিঙ্গণ)	দেশ শারদীয় ১৯৪৮
বিক্রমখোল (আরো একটি)	বঙ্গশ্রী বৈশাখ ১৩৪০
বিপদ(অসাধারণ)	দেশ শারদীয় ১৯৪৫
বিরজা হোম ও তার বাধা (রূপহলুদ)	মৌচাক শ্রাবণ ১৩৫৫
বুধোর মায়ের মৃত্যু (ক্ষণভঙ্গুর)	দেশ শারদীয় ১৯৩৭
বেসাতি (মুখোশ ও মুখশ্রী)	প্রত্যহ শারদীয় ১৩৫৩
বৈদ্যনাথ (যাত্রাবদল)	উদয়ন ফাল্গুন ১৩৪০
ভণ্ডুলমামার বাড়ি (যাত্রাবদল)	প্রবাসী পৌষ ১৩৩৯
ভিড় (নবাগত)	শনিবারের চিঠি অগ্রহায়ণ ১৩৫০
ভূত (বি. র.৯/আরো একটি)	খগেন্দ্রনাথ মিত্র স. সপ্তডিঙা পূজাবার্ষিকী ১৩৫২
মণি ডাক্তার (কিন্নর দল)	বঙ্গশ্রী আশ্বিন ১৩৪৪
মরফোলজি (ছায়াছবি)	আনন্দবাজার পত্রিকা বার্ষিক দোল সংখ্যা ১৩৫২
মাকাললতার কাহিনী (অসাধারণ)	আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় ১৩৫২
মুক্তপুরুষ হরিদাস (মুখোশ ও মুখশ্রী)	গল্পভারতী দ্বিতীয় বার্ষিকী ১৩৫৪
মুক্তি (নবাগত)	আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৫০
মূলো র‍্যাডিশ-হর্স র‍্যাডিশ (বিধুমাস্টার)	আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় ১৩৪৯
মেঘমল্লার (মেঘমল্লার)	প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৩০
মেডেল (তালনবমী)	প্রেমেন্দ্র মিত্র স.মায়ামুকুর শারদীয়া ১৩৪৭
মৌরীফুল (মৌরীফুল)	প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩০
যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ (জন্ম ও মৃত্যু)	বঙ্গশ্রী আশ্বিন ১৩৪২
যাচাই (বাক্সবদল/অনুসন্ধান)	গল্পভারতী বৈশাখ ১৩৫৭
যাত্রাবদল (যাত্রাবদল)	বিচিত্রা পৌষ ১৩৩৯
রঙ্কিণীদেবীর খড়্গ (তালনবমী)	মৌচাক আশ্বিন ১৩৪৭
রহস্য (ভৌতিক গল্প)	মৌচাক আশ্বিন ১৩৫১
রাজপুত্র (তালনবমী)	মৌচাক শ্রাবণ ১৩৪০ (অতিথি নামে)
রামশরণ দারোগার গল্প (জন্ম ও মৃত্যু)	দেশ জানুয়ারি ১৯৩৬
রাসু হাড়ি (মুখোশ ও মুখশ্রী)	আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় ১৩৫৩
লেখক (জন্ম ও মৃত্যু)	আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় ১৩৪২
শিকারী (কুশল পাহাড়ী)	কথা-সাহিত্য পৌষ ১৩৫৬
শেষ লেখা (কুশল পাহাড়ী)	শনিবারের চিঠি অগ্রহায়ণ ১৩৫৭
সই (জন্ম ও মৃত্যু)	নতুন পত্রিকা জানুয়ারি ১৯৩৬
সংসার (জ্যোতিরিঙ্গণ)	দিগন্ত আশ্বিন ১৩৫৫
সিঁদুরচরণ (ক্ষণভঙ্গুর)	গল্পভারতী বৈশাখ ১৩৫২

Dhaka University Institutional Repository

সীতানাথের বাড়ী ফেরা (কুশল পাহাড়ী)	যুগান্তর শারদীয় ১৩৫৭
সুলোচনার কাহিনী (বিধুমাস্টার)	প্রবাসী আশ্বিন ১৩৪৭
স্বপ্ন-বাসুদেব (নবাগত)	দেশ ডিসেম্বর ১৯৪৩
হরিকাকা (কুশল পাহাড়ী)	তরুণের স্বপ্ন শ্রাবণ ১৩৫৭
হাট (ক্ষণভঙ্গুর)	দেশ আগস্ট ১৯৪৫
হিঙের কচুরী (জ্যোতিরিঙ্গণ)	গল্পভারতী আশ্বিন ১৩৫৫

Dhaka University Institutional Repository

গ. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. বিভূতি রচনাবলী। প্রথম.. দ্বাদশ খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: প্রথম প্রকাশনা। ১৯৯৪।
২. বিভূতিভূষণ: জীবন ও সাহিত্য। সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্যায়ন। সেপ্টেম্বর ১৯৯৫।
৩. পথের কবি। কিশলয় ঠাকুর। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। জানুয়ারি ১৯৯৫।
৪. বিভূতি স্মৃতি। সম্পা: বারিদ বরণ ঘোষ। সাহিত্যম্। জানুয়ারি ১৯৯০।
৫. বিভূতিভূষণ-দ্বন্দ্বের বিন্যাস। রুশতী সেন। প্যাপিরাস। সেপ্টেম্বর ১৯৯৩।
৬. বিভূতিভূষণ॥ আধুনিক জিজ্ঞাসা। সম্পা: অরুণ সেন। সাহিত্য অকাদেমি। ১৯৯৭।
৭. আমার শিক্ষক বিভূতিভূষণ। অবিরলাল মুখোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:। ১৪০২।
৮. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রুশতী সেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। মে ১৯৯৯।
৯. বিভূতিভূষণ: মন ও শিল্প। গোপিকানাথ রায় চৌধুরী। দেশ পাবলিশিং। এপ্রিল ১৯৯৬।
১০. আমাদের বিভূতিভূষণ। রমা বন্দ্যোপধ্যায় ও মৌসুমী পলিত। মিত্র ও ঘোষ পাবিলিশার্স প্রা: লি:। জানুয়ারি ১৯৯৭।
১১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যয়ের ছোটগল্প। প্রমথনাথ বিশী।
১২. সাহিত্যে ছোটগল্প। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:। ১৪০৫।
১৩. রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পরূপ। সৈয়দ আকরম হোসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩৮৮।
১৪. ছোটগল্পের সীমারেখা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বাক্-সাহিত্য প্রা: লি:। ১৪০৬।
১৫. ছোটগল্পের অন্তর্ভুবন। তপোধীর ভট্টাচার্য। মহাজাতি প্রকাশন। ২০০০।
১৬. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার। শ্রীভূদেব চৌধুরী। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা: লি:। ১৯৯৯।
১৭. ছোটগল্পের কথা। রথীন্দ্র নাথ রায়। পুস্তক বিপণি। জানুয়ারি ১৯৯৬।
১৮. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত। ড.অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা: লি:। ১৯৯৮-১৯৯৯।
১৯. সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়। শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। জয়দুর্গা লাইব্রেরী। ১৯৮৮।
২০. সাহিত্য সন্দর্শন। শ্রীশ চন্দ্র দাস।
২১. সাহিত্য কোষ। কবীর চৌধুরী। শিল্পতরু প্রকাশনী। ডিসেম্বর ১৯৯৩।
২২. A Glossary of literary terrms. M.H. Abrams. Sixth Edition.
২৩. A short history of English Literature. Ifore Evans. Penguin Books. 1990.
২৪. বাংলা ছোটগল্পঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ। বীরেন্দ্র দত্ত। পুস্তক বিপণি। মে ১৯৯৫।
২৫. বাংলা ছোটগল্প। শ্রীভূদেব চৌধুরী।